প্রথম প্রকাশ : কবিপক্ষ, ১৩৮২
প্রচ্ছদ : শিশির কর্মকার

মুদ্রক : ইভা চৌধুরী
লায়ন্স্ প্রেস
১৪৩/১, শিবপুর রোড
হাওড়া-২

প্রকাশক : শ্যামলকুমার বোস
এস্, বি, পাব্লিশার্স
৯, ক্র্যেকেড লেন
কলিকাতা-৬৯

মামণিকে—

লেখকের নিবেদন

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একদা ওস্তাদ আব্দুল করিম খাঁ-র গান শোনবার আমন্ত্রণ পেয়ে দীলিপকুমার রায়কে শুধিয়েছিলেন, "ওহে তোমার ওস্তাদ থামতে জানেতো ?" ঐ কয়েকটি শব্দে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের মনের কথাই যেন শরৎবাবু ব্যক্ত করেছেন। নৈর্ব্যক্তিক তানলয় সাধারণ মানুষের কাছে দুর্বোধ্য, একঘেয়ে, ক্লান্তিকর। এক্ষেত্রে বাঁচোয়া এই পুস্তকে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের কোন তত্ত্ব কথা নেই। মানুষ আলাউদ্দিন খাঁ-কে নিয়েই আমাদের কথা। যদিচ তার জীবনটাই সঙ্গীত।

যাকে সত্য বলে জানি তাকে প্রাণপণ আঁকড়ে ধরাই সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষের লক্ষণ। তা ঈশ্বর প্রাপ্তির সাধনাই হোক, আর বিজ্ঞান সাহিত্য সঙ্গীতই হোক। সেই নিরিখে আচার্য আলাউদ্দিন খাঁ-র আসনও স্থায়ী ভাবে পাতা রয়েছে ঐ মহাপুরুষদের মধ্যে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের পরে ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক জগতে এমন সার্থকনামা পুরুষ আর দ্বিতীয়টি নেই। এই আচার্য মনীষী সম্বন্ধে সাধারণ মানুষ সামান্যই জ্ঞাত আছেন। সাময়িক পত্র-পত্রিকায় কিছু প্রবন্ধ প্রচারিত হওয়া ছাড়া বড় একটা কিছু লেখাও হয়নি। এ ত্রুটি বাংলা সাহিত্যের জীবনীকারদের।

অচার্যের জীবন যে বাণী প্রচার করেছে তা সার্বজনীন। একনিষ্ঠ একাগ্রতায় মানুষ কি না করতে পারে। কর্মক্ষেত্রের সর্বস্তরেই তা প্রযোজ্য। এই নৈরাজ্যের যুগে জীবন্ত আশার বাণী। জাতি গঠনের মূল সূত্রও নিহিত রয়েছে আচার্যের জীবনে। নিরবিচ্ছিন্ন অধ্যবসায়, বিনয়, আত্মত্যাগ, মানব প্রেম। জাতি গঠনের জন্যে শিশু পাঠ্যেও তার স্থান পাওয়া উচিত সর্বাগ্রে।

আচার্যের কীর্তি মহিমা সঠিক ভাবে প্রচারিত হলে বাঙালী হিসেবে দুই বাঙলার মানুষের কাছেই তা হয়ে উঠবে শ্লাঘার বস্তু।

ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতকে বলা হয় গুরুমুখী বিদ্যা। মুখে মুখে তা গুরুপরমপরায় চলে এসেছে। লেখা-জোকায় বাঁধা পড়েনি। ছন্দলয়ের বিস্ময়কর গাণিতিক জটিলতাও মুখে মুখে সমাধান করে দেন আমাদের সঙ্গীতজ্ঞরা। মুখে মুখে গড়ে ওঠে তাদের জীবনী। এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। শুনে শুনেই আমাকে লিখতে হয়েছে এই কিতাব। লিখিত তথ্য যেটুকু পাওয়া যায় তাও শোনা কথার লিখিত ভাষণ মাত্র। সঠিক সন তারিখের বিচায় অসম্ভব হয়ে ওঠে।

আরো মুস্কিল হয়েছে এই জন্যে যে আচার্য আলাউদ্দিনের জন্ম হয়েছে পূর্ববঙ্গের এক অজ গ্রামে, সাধারণ গৃহস্থ ঘরে। ইস্কুল কলেজ বা সরকারি হিসাব কিতাবের মধ্যে দিয়ে বেড়ে ওঠেননি। আট বছর বয়েসেই গৃহহারা, নিরুদ্দেশ। তার বিশ্ববিদ্যালয় উন্মুক্ত আকাশের তলে, সাধারণ মানুষের ভিড়ে। তার শিক্ষক প্রায় সবাই নিরক্ষর। যাদের বা অক্ষর জ্ঞান ছিল তাদেরও কিছু দায় ছিল না এই অকিঞ্চিৎকর ছাত্রের ইতিবৃত্ত লিখে রাখবার। এই পরিস্থিতিতে পাঠক হয়ত সহজেই অনুমান করতে পারবেন এই গ্রন্থে এত কথা লেখা হলেও আচার্যের জন্ম তারিখের কেন উল্লেখ নেই। পরিণত বয়সে আচার্যকে শুধালে যে জবাব পাওয়া গেছে তাতে অনেকরই ধন্দ লেগেছে। আমি সে দ্বন্দ্বে যেতে চাইনি। শুধু এইটুকু বলা যায় যে মহাঅষ্টমী তিথিতে তার জন্ম। আর সঙ্গীতগুরু নুলো গোপালের মৃত্যু তারিখ ১৮৯৭ সাল ধরে পিছিয়ে গেলে আচার্যের জন্ম তারিখের কাছাকাছি পৌঁছান যেতে পারে। কোন ঘটনা রবিবার ঘটেছিল কি শনিবার ঘটেছিল তার চেয়ে কি ঘটেছিল তার সঠিক মূল্যায়ন করার দিকেই আমার দৃষ্টি ছিল। সে কাজে কতটুকু সফল হয়েছি সহৃদয় পাঠক বিচার করবেন।

মুখে মুখে ছড়িয়ে থাকা ঘটনার সত্যতা যাচাই করার জন্যে আমাকে যেতে হয়েছে জনে জনে। সেই দীর্ঘ নামের তালিকায় রয়েছেন ৺ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, ৺ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, আচার্যের প্রথম যুগের শিষ্য শ্রীতিমির বরণ ভট্টাচার্য থেকে কনিষ্ঠতম শিষ্য শ্রীবলাই বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম। অধুনালুপ্ত দৈনিকের সঙ্গীত সমালোচক হিসেবে আচার্য পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ট ভাবে মেশার সুযোগ হয়েছিল আমার। বিভিন্ন সময় তাদের উক্তির সতর্ক নোট রেখেছিলাম। একটু একটু করে তথ্য সংগৃহিত হয়েছিল।

তথ্য সংগৃহিত হলেও এ বই লেখা হত কিনা জানি না, যদি না আচার্য পুত্র আলি আকবর খাঁ সহসা একদিন বলতেন, "রবিশঙ্করজী বাবার জীবনী নিয়ে একটি চলৎচ্চিত্রের কথা ভাবছেন, আপনি তাড়াতাড়ি বাবার জীবনের একটা সংক্ষিপ্তসার লিখে দিন।" লেখা দ্রুততালে এগিয়ে গেল। প্রথম পর্ব সমাপ্ত প্রায়, এমন সময় জানা গেল 'আলি আকবর-রবিশঙ্কর' বিশ্বপরিক্রমায় বেরুচ্ছেন। চলৎচ্চিত্র প্রযোজনার সময় সংকুলান আর হল না, কিন্তু ধীরে ধীরে ঠেকে ঠেকে আমার লেখাটি সমাপ্ত হয়ে গেল।

আচার্য পৌত্রদ্বয় আশিস ধ্যানেশও আমাকে তথ্য যুগিয়ে নানা ভাবে সাহায্য করেছেন। ছবি দিয়েছেন। সেক্ষেত্রে আমিই সব গ্রহণ করতে পারিনি পুঁথি প্রকাশের আরো বিলম্ব ঘটে যাবার আশঙ্কায়। ঠিক এই কারণেই অনিচ্ছা সত্বেও ওস্তাদ আলি আকবরের অনুপস্থিতিতেই এই বই প্রকাশ করা হল। যদিচ পূর্বেই এর অর্ধেক পাণ্ডুলিপি তিনি দেখেছেন। বর্তমানে তিনি আমেরিকায়। যোগাযোগের চেষ্টা হচ্ছে। আশা রইল দ্বিতীয় সংস্করণে তার মতামত সংকলিত করা সম্ভব হবে। সন তারিখের কিছু ত্রুটিও দূর হবে। বানান ভুলের শুদ্ধিপত্র দিয়ে ভুলগুলিকে আরো উচ্চকিত করা হল না। এ সংস্করণের খামতিসহ সর্বসত্ব লেখকের সংরক্ষিত।

আচার্যের কয়েকটি চিঠির অংশ সংগৃহিত হয়েছে ত্রিপুরা সরকারের জনসংযোগ দপ্তরের পত্রিকা পাক্ষিক 'গোমতী' থেকে। বলা বাহুল্য মূল চিঠির বানান ও প্রকাশ ভঙ্গীর কোন পরিবর্তন করা হয়নি। 'গোমতী' সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণপদ দত্ত মহাশয়ের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

ওস্তাদ ওয়াজীর খাঁ-র অপ্রকাশিত ছবিটি দিয়েছেন শ্রীবিমলা-কান্ত রায় চৌধুরী আর প্রচ্ছদের বিখ্যাত ছবিটি পেয়েছি শ্রীভাইডো সান্যালের কাছ থেকে। যাদের নাম প্রকাশ করা হল, আর যারা রয়ে গেলেন নেপথ্যে তাদের সকলের কাছেই এই নিঃস্বার্থ সহযোগিতার জন্যে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।

কবিপক্ষ, ১৩৮২ বিক্রম দাশ
কলিকাতা-১৯

আচার্য আলাউদ্দিন খাঁ-র বংশ তালিকা
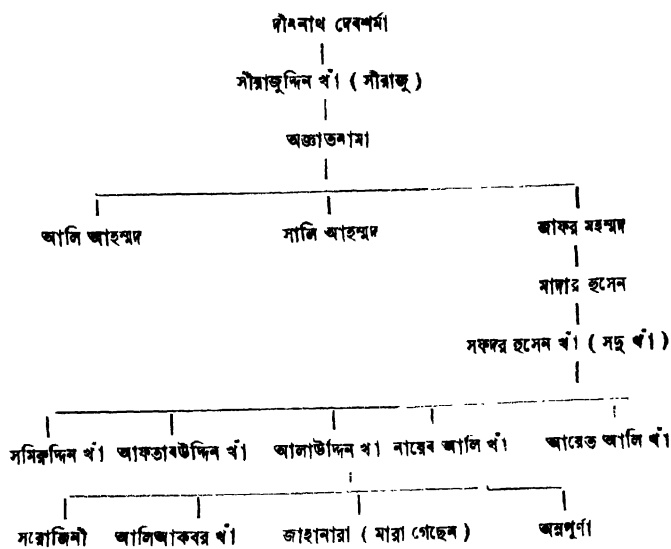
আলাউদ্দিনের গুরু ওস্তাদ ওয়াজীর খাঁ
(এই শতকের প্রথমভাগে কলকাতায় গৃহিত ফটো)

ছায়াসঙ্গীনী মদনমঞ্জরী
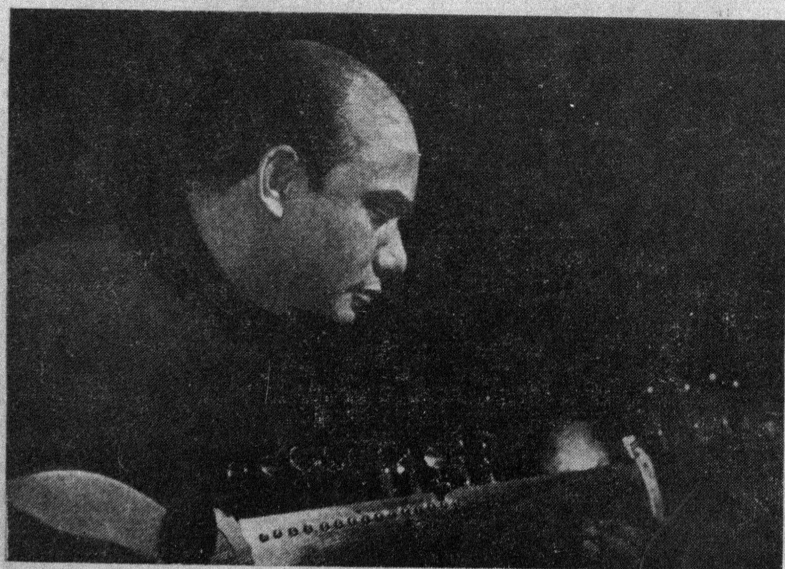
পুত্র আলি আকবর খাঁ

জামাতা রবিশঙ্কর

আলাউদ্দিন বলেন, "আমি আর একটি পুত্র চেয়েছিলাম। ভগবান দেননি। না, তাও দিয়েছেন। আমি রবুকে পাইছি।"
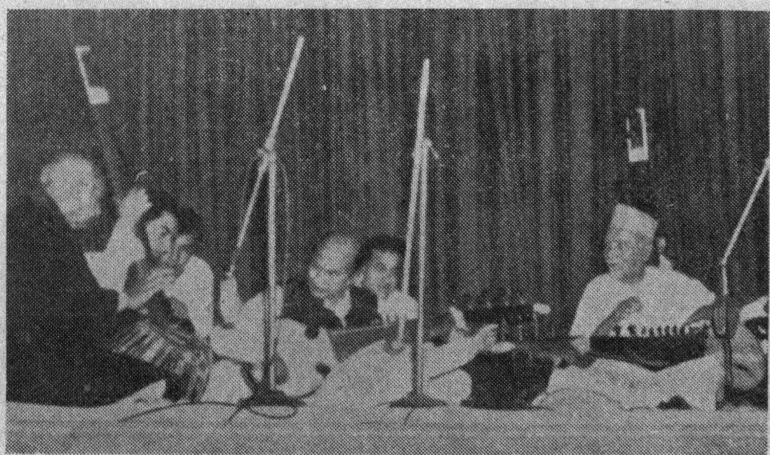
তিন পুরুষ। আচার্য, আচার্য পুত্র আলি আকবর, নাতি আশিস। তবলায় কণ্ঠে মহারাজ।

ভবিষ্যতের স্বপ্ন

গুরুমাতার কোলে ভবিষ্যতের শিল্পী

ঘর ছাড়া
মা-এর বাক্স ভেঙে নিরুদ্দেশ

॥ এক ॥

শেষপর্য্যন্ত কথাটা আলমের মার কানেও উঠল। ঐতো আট বছরের ছেলে,—এর মধ্যেই পাঠশালা ফাঁকি দিতে শিখেছে! এমনি বিদ্যে। বাড়ি থেকে বইপত্তর নিয়ে বেরোয় ঠিকই, কিন্তু যায় না পাঠশালায়। যাবার পথে বুড়ো শিবতলার মন্দিরে গিয়ে লুকিয়ে থাকে। ওদিকে পাঠশালার মত পাঠশালা যায় বয়ে। আবার ফিরতি পথে পড়ুয়াদের সঙ্গ ধরে ফেরে বাড়ি। এই নাকি চলেছিল আজ কিছুদিন ধরে।

শুনে মা-র বুক ওঠে কেঁপে বুড়ো শিবতলায় যত সাধু-সন্ন্যেসীদের আড্ডা। কে জানে তাঁদের নাম ধাম? কি তাঁদের পেশা? গোপন ডাকাত দলের কেউ নয়তো? এখানে লুকিয়ে এসে থাকছে কিনা গোপনে তাইবা কে বলবে? কিম্বা ছেলে ধরা! যত ভাবেন তত মা-র প্রাণ করে দুরু দুরু।

তিনি এ বংশের কোন কথাটা না জানেন! এঁদের ঠাকুর্দ্দার বাবা নাকি ছিলেন সেই উত্তরবঙ্গের সন্ন্যেসী বিদ্রোহীদের মধ্যে, যারা কিনা ইংরেজদের হাটিয়ে দেবার জন্যে লড়াই বাধিয়ে দিয়েছিল। শেষ পর্য্যন্ত ইংরেজদের অত্যাচারে আর টিঁকতে পারলেন না। লুকিয়ে এসে মুসলমান নাম নিয়ে নাকি ঠাঁই নিয়েছিলেন ত্রিপুরা জেলার এই শিবপুর গ্রামে। ইংরেজরা হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াত সেই সব সন্ন্যেসীদের। বলত, ডাকাত।

তাইতো বুড়ো শিবতলার মন্দিরের ঐ সাধুসন্তের নামেই মা-র ভয় লাগে। আর আর পড়ুয়াদের সঙ্গে রোজকার মত সেদিনও আলম বাড়ির উঠোনে পা দিতেই মা ছেলের দু'হাত ধরে ঠাস ঠাস করে দু'গালে কসিয়ে দিলেন দু'চড়। বললেন, "হতভাগা, এই বয়সেই

পাঠশালা পালিয়ে ঐ সাধুসন্তদের আড্ডায় গিয়ে ভিড়েছিস! বড় হয়ে ডাকাত হবি? বল? বল?"

ছেলেটা তখন কাঁদো কাঁদো হয়ে বললে, "পাঠশালায় খালি খালি পড়তে বলে! আমার ভাল লাগে না যে—"

মা বললেন, "কি ভাল লাগে শুনি? ঐ বাউণ্ডুলে ডাকাতদের আড্ডা?"

ছেলে মাথা ঝাঁকিয়ে বললে, "হ্যাঁ।—ওঁরা যে কত সুন্দর সুন্দর গান গায়, সেতার বাজায়—আমি তো তাই সারাদিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনি।"

এ-বংশের আর এক রোগ এই গান বাজনা। ছেলের বাবাও সেতার বাজান। এর বড় ভাইটিও সেতার নিয়ে আছে। এখন এই ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলেরাও যদি লেখাপড়া ছেড়ে এখন থেকেই সেতার টিং টিং করা নিয়ে মেতে ওঠে তবে এই গেরস্ত সংসারের গতি হবে কী? তিনি একা আর ক'দিন সামলাবেন? না, ছেলেদের এখন থেকে আচ্ছা শাসনে রাখতে হবে। পাঠশালা-পালান অপরাধী ছেলেটার হাত-পা বেঁধে ঢেঁকি ঘরে রাখলেন আটকে। বললেন, "তোমার আজকে খাওয়া বন্ধ।"

আলমরা পাঁচ ভাই, দুই বোন। ভাইদের কারো সাহস হল না এই দুর্গতির হাত থেকে ক্ষুদে ভাইটিকে রক্ষা করে। সবাই জানে, এ বাড়ীতে মার কথার ওপর কারো কথা চলে না। তার কথাই কথা! বোনেরা কেউ নেই কাছে। এক বোনের বিয়ে হয়েছে ভিন্ দেশে, আর এক বোন থাকে পাশের গাঁয়েই। কি করে পাশের গাঁয়ে দিদির শ্বশুর বাড়ি গেল খবর। দিদি মধুমালতী খবর শুনে ছুটে এলেন। আহা! তাঁর এই আট বছরের রোগা নিরীহ মাথা-বড় ক্ষুদে ভাইটির জন্যে বড় দরদ। শ্বশুর ঘর-করা মেয়ে মা'কে অত ভয় করবে কেন? মধুমালতী

ভাইটিকে ঢেঁকি ঘর থেকে উদ্ধার করে আদর করে ভাত বেড়ে দিলেন খেতে। "ঢেঁকি ঘরে একা কেঁদে কেঁদে ছেলেটা—আহা গো"। যাবার বেলায় মাকে দু'কথা শুনিয়েও গেলেন মধুদিদি, "দুধের বাছাকে অমন করে মারতে আছে।"

মধুদিদি চলে যেতেই আলম বুঝল তার কোনো ভরসা নেই। তার মনের কথা কেউ বুঝবে না। ছোট হলেও আলম বুঝল মা আর তাকে কিছুতেই যেতে দেবেন না ঐ বুড়ো শিবতলায়। ছেলেটার দু'চোখ বেয়ে টপ টপ করে জল গড়িয়ে পড়ে।

বেলা গড়িয়ে আসে। কোকিল ডাকে আমের ডালে। থেকে থেকে নিঝুম গাঁয়ে দূরে কোথাও ঢেঁকির পাড়ের শব্দ হয় ধুপ্ ধুপ্। দূরে শিমূল গাছের বাঁকের পথে হাটুরেরা যায় হাটের পথে। পাড়ার ছেলেরা খেলতে বেরোয়। ছেলেটার মন যায় না খেলায়। একা একা লুকিয়ে বেড়ায়। মনে শুধু ঐ কথাই জাগে, "আমি আর শুনতে পারব না গান—শুনতে পারব না সেতার বাজনা।" ভাবতে ভাবতে ছেলেটার বুক ওঠে দুলে দুলে। চোখ দুটি জলে আসে ভরে। "সকাল সন্ধ্যায় আমাকে বসতে হবে বই নিয়ে, যেতে হবে পাঠশালায়—"। একথা ভাবতেও ছেলেটার দম যেন বন্ধ হয়ে আসে। কাউকে বলে বোঝাতে পারে না মনের অবস্থা। কেউ বোঝে না। দুনিয়াটা কি নিষ্ঠুর! কি বোকা! ছোট বলেও কাউকে রেহাই দেবে না। "না না আমি থাকব না এ সংসারে।" চোখের জল মুছে এক সময় বড় মাথাটা ঝাঁকিয়ে বলে উঠল আলম। "যেখানে গান নেই, বাজনা নেই, সেখানে কেন আমি থাকব।"

তখন রাত হয়েছে। মা সংসারের এটা ওটা করছেন। ভাই বোনেরাও কেউ নেই ঘরে।

আলম জানে, মা কোন হাঁড়িতে টাকা পয়সা রাখেন। তখনকার

দিনে বাক্স-প্যাঁটরার চলন তত ছিল না। লোকে মাটির হাঁড়িতেই টাকা পয়সা রাখত। আলম এক ফাঁকে মার মাটির হাঁড়িতে হাত গলিয়ে তার কচি হাতে যত ক'টা ধরল তাই এক খাব্লা নিয়ে একখানা জামা দিয়ে মুড়ে ঢেঁকি ঘরে লুকিয়ে রাখল। সবাই যখন ঘুমিয়েছে, তখন সেই জামা আর ক'টা টাকা নিয়ে আট বছরের কচি ছেলে আলম পা টিপে টিপে ঘর ছাড়া হয়ে বেরিয়ে পড়ল পথে। কোথায় গেলে আবার শুনতে পাবে গান? বাজনা? চারিদিকে তখন নিশুতি রাত।

॥ দুই ॥

আলমতো বাড়ি থেকে বেরুল! যে ছেলে এই আট বছর বয়সে একদিনের তরেও মা-এর কাছ ছাড়া হয়নি সে কিনা বাড়ি ছেড়ে বেরুল এই নিশুতি রাতে! পথঘাট অন্ধকার। ছায়ায় যেন ছায়ার মত দাঁড়িয়ে আছে গাছপালা। কেউ কোথাও নেই। গা ছম্ছম্ করে। আলম পথ হাঁটে।

সে বুঝে নিয়েছে এই দুনিয়ার কেউ নেই তার সহায়। পাড়াপড়শী? না, কেউ না। পাড়া প্রতিবেশীরাই তো মা-র কাছে লাগিয়েছে "কিগো আলমের মা, আলম কে যে দিনরাত বুড়ো শিবতলায় দেখি—ঐ সাধু সন্তদের আখড়ায় গিয়ে গিয়ে শেষে হিন্দু না বনে যায় ছেলেটা! আলমের মা, সাবধান! ছেলেকে যেতে দিওনা ঐ বুড়ো শিবতলায়।"

এখন সেই বুড়ো শিবতলায় গেলে কালই সবাই মিলে ধরে টেনে আনবে। মা বলবেন, "রাখো ওকে হাত পা বেঁধে। ডাকাত হতে যাচ্ছিল।" পাড়া-পড়শীরা বলবে, "ভাগ্যে আমরা ছিলাম।

নইলে ছেলেটা বুঝি যেতই হিন্দু হয়ে।" মধুদিদির বাড়িতে গেলেও ঐ দশাই করবে। কেউ বুঝবে না, ওরা যে গান গায়, বাজনা বাজায়।

মনের দুঃখে ছেলেটা পথ হাঁটে। তার বুক ভরা বড় কষ্ট! হাঁটতে হাঁটতে ছাড়িয়ে যায় বুড়ো শিবতলা। ছাড়িয়ে যায় মধুদিদির শ্বশুর বাড়ির গাঁয়ে যাবার পথ। আলম সেই পথ ধরে—যে পথ ধরে গাঁয়ের লোক চলে যায় ভিন দেশে। দূর দূরান্তে। কোথায়? তা কে জানে? আলম শুধু জানে যেখানে চলে গেলে বাড়ীর লোক কিছুই করতে পারে না। পাড়া-পড়শীরাও ধরে আনতে পারবে না। অনেক-অনেক দূর!

আলম ছাড়িয়ে এল এপাড়া, ওপাড়া, সেপাড়া। পেরিয়ে গেল গাঁয়ের সীমা। কিছুদূর গিয়ে পথ গিয়েছে বেঁকে। পাশে মস্ত জলাভূমি। দিনের আলোতেও এ মাথা থেকে ও মাথা দেখা যায় না। এমনি বিরাট। বর্ষার জল বছরের পর বছর জমে থাকে এখানে, বেরুবার পথ নেই। ওদেশের লোক এমনি জলাভূমিকে বলে 'হাওর'। এই জনমানব শূন্য হাওর পেরিয়ে মানিকনগর। তারপরে নদীর ধারে শ্যামগঞ্জের লঞ্চের ঘাট।

আলম হাওরের পাশ দিয়ে হাঁটে, অন্ধকারে জলের রেখা দেখা যায় আবছা আবছা, ভয়ে ভয়ে এদিক ওদিক চায়।

এই হাওরে বছরের পর বছর যত রাজ্যের মরা জন্তু-জানোয়ার আগাছা, আবর্জ্জনা, জমে জমে পচে জলের তলায়। আর পচে পচে জলের তলায় এক রকমের গ্যাস তৈরী করে। নাম 'ফস্‌ফরাস'। যা কিনা ঠেলে উঠে জলের ওপরে বাতাসের গায়ে লাগলেই জ্বলে ওঠে দপদপিয়ে। গাঁয়ের লোক দূর থেকে কখনো-সখনো দেখতে পায় এই আগুন। রাত-বেরাতে ঐ হাওরের জলের ওপর আগুন

দেখে তারা যে কতরকমের কথা বলে যা শুনলেও ছোটদের ভয়ে কাঁপুনি ধরে। তারাতো হামেশাই বলে,—"এই হাওর থেকে মাছ ধরে হয়ত কেউ ফিরছে বাড়ি। তেঁতুলতলা পর্যন্ত এসেছে—তখন হয়ত একটা কালো বেড়াল ম্যাঁও ম্যাঁও করে কয়েকবার ডেকে সামনে দিয়ে রাস্তার এদিক থেকে ওদিকে পার হয়ে গেল। তখন সবচেয়ে বড় মাছটা যদি রেখে এলে তেঁতুল তলায়, তবে সে যাত্রা রক্ষা। নইলে আলগোছে তুলে নিয়ে মট করে ঘাড়টা ভেঙে পুঁতে রাখবে। ঐ হাওরের কাদার তলায়। এওতো কত শোনা গেছে, রাত-বেরাতে ঘুমের মধ্যে পরিচিত লোকের গলার মত গলা করে ডেকে ডেকে ভুলিয়ে ভালিয়ে এই হাওরের মধ্যে এনে—তারপরে— ?

আলম হাওরের পাশ দিয়ে হাঁটে আর বড়দের ঐ সব ভূতুড়ে গল্প মনে পড়ে। যত মনে করতে চায় না। ততই যেন আরো বেশি করে মনে আসে। ভয়ে গাটা ওঠে শিরশিরিয়ে। এই হাওরের তলায় যে সব দেহ পোঁতা আছে তাদের প্রেতআত্মা নাকি সারাদিনটা থাকে কাদার তলায়, চুপচাপ। কিন্তু রাত্তির হলেই নাকি ছাড়া পায়, বেরিয়ে আসে বাইরে। রাত্তিরে যত রাজ্যের ডাকিনী প্রেতিনীদের নাকি আড্ডা জমে এই নির্জন হাওরের মধ্যে। জলের ওপর চলে তাদের ধেই ধেই নৃত্য, হুটোপুটি। বুকের মধ্যে ভাটার মত দুই চোখ, আগুনে এলো চুল, হা হা বিকট হাসি। আগুন জ্বলে আর নেভে।

এই হাওরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে আলমের বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস করতে লাগল। জনপ্রাণী কেউ নেই। চারিদিকে কেমন একটা মিউনো ফ্যাক্যাশে আলো। হাওরের দিকে চোখ পড়লেই যেন খারাপ কিছু একটা নজরে পড়বে। ছেলেটা সেদিকে তাকাতে চায় না, তবু চোখ গিয়ে পড়ে। আবার সোজাভাবে যে দেখে নেবে, সে সাহসও নেই। একটু একটু করে চোখের

আড়ে আড়ে চায় আর পথ চলে। ভয়ে একেবারে আধমরা হয়ে যায়। এমনিভাবে যে কতক্ষণ পথ চলে ভাবতেও বুকের মধ্যে হাঁপ ধরে আসে। চলছে তো চলছেই।

এক সময় আলমের গাটা একেবারে ঝাড়া দিয়ে উঠল! দূরে মিটমিটে আলো। জ্বলছে নিভছে। একটা বিকট চিৎকারের মত শব্দ একেবারে হা হা করে উঠল। হঠাৎ মনে হল কে যেন তার পেছনে আসছে। দূরে কারা যেন ফিসফাস করে কি সব বলাবলি করছে। ছেলেটা বুঝি এবার সত্যি সত্যিই জ্ঞান হারিয়ে ফেলে! দম যেন বন্ধ হয়ে আসে। আর বুঝি পারে না!

এমন সময় অদ্ভুত এক কাণ্ড ঘটল। সারাটা পথ ভয় পেয়ে পেয়ে ছেলেটার এমন অবস্থা হয়েছিল যে, সে যে, কখন হাওর ছাড়িয়ে শ্যামগঞ্জের লঞ্চের ঘাটে এসে পৌঁচেছে, বুঝতে পারেনি। দূরে নদীর মধ্যে চলতি নৌকার আলো, লঞ্চের সীটি, লোকজনের কথাবার্ত্তা, সবই মনে হচ্ছিল বুঝি ভূতুড়ে কাণ্ড। হঠাৎ ঘাটের লোকজনের কথাবার্ত্তা শুনে তার সে ভুল ভাঙল। দেখল, তার সামনেই বাধা রয়েছে শ্যামগঞ্জের লঞ্চ।

তবে ছাড়িয়ে এসেছে ঐ হাওর? ঐ যত সব ভূতুড়ে কাণ্ড-কারখানা? ভেবে ছেলেটা যেন হাপ ছেড়ে বাঁচল! "আঃ—"। একদল লঞ্চের যাত্রী যখন নিজেদের মধ্যে কথাবার্ত্তা বলতে বলতে তার পাশ দিয়ে গিয়ে উঠল লঞ্চে, তখন সেও অমনি সমস্ত ভয় ঝেড়ে ফেলে এই রাত্রির অন্ধকারে তাদের পেছনে পেছনে গিয়ে উঠে বসল লঞ্চে। তাকে যে যেতে হবে অনেক—অ—নেক দূর। ভয়ে ক্লান্তিতে ছেলেটা লঞ্চের এক কোণে যে কখন ঘুমিয়ে পড়ল কেউ লক্ষ্য করল না। এক সময় লঞ্চটা সীটি দিয়ে ছেড়ে দিল। আলম তখন ঘুমিয়ে কাদা। লঞ্চ চলল গাঁয়ের সীমা ছাড়িয়ে।

কে জানে? বুঝি আলমকে নিয়ে চলল নতুন কোনো অজানা সুরের রাজ্যে।

॥ তিন ॥

আলমের যখন ঘুম ভাঙল তখন ভোর হয়ে গেছে। লঞ্চ এসে ভিড়েছে শীতলক্ষা নদীর তীরে, নারায়ণগঞ্জের ঘাটে। তরলছায়ার মত জলে পড়েছে ভোরবেলাকার আলোর আভা। একটু একটু করে সূর্য্য উঠছে। ঝিকমিক ঝিকমিক করছে মাঝ নদীতে।

চোখ মেলেই ভোরবেলাকার এই আলোর ছোঁয়ায় ছেলেটার মন একেবারে খুশিতে ভরে উঠল। উঃ কাল কি ভয়ঙ্কর রাত্রিই না গেছে! খারাপ খারাপ স্বপ্নের মত সেই রাত আর নেই। নেই আর সেই দম আটকানো অন্ধকার।······

কাক ডাকছে ডাঙ্গায়। গাঙ চিল হাল্‌কা হাওয়ায় ভর করে ডাকছে পাক খেয়ে খেয়ে। চারদিকে লোকজনের হাঁকডাক। পাটের নৌকোয় বোঝাই হচ্ছে পাট, যাত্রীদের নৌকোয় যাত্রী। ডাঙ্গার ধার ঘেঁসে গিজগিজ করছে নৌকো। যাত্রীদের সঙ্গে আলমও তড়বড় করে উঠে এল ডাঙ্গায়।

চারিদিকে লোকজন। দোকানের সারি। খাবারের দোকানে থরে থরে খাবার সাজান। ভোরবেলাকার আলোর সাথে সব কিছুই যেন একেবারে হেসে উঠে বলছে, "এসো ভাই, এসো। এখানে ভয় কি? কিসের ভয়?"

শিবতলির অজ পাড়াগাঁয়ের ছেলে আলম। পালা-পার্ব্বণে মেলাতেও দেখেনি এত লোকজন দোকান পাট। শোনেনি এত হৈ-হট্টগোল। সব কিছুই যেন কেমন অদ্ভুত মনে হয়। আলম চোখ মেলল আর সব কিছু যেন এই মাত্র উঠল মাটি ফুঁড়ে। সব কিছু নতুন। অন্যরকম। কাল রাত্তিরের সেই কালো মৃত্যুর সাগর পাড়ি দিয়ে ছেলেটা মুহূর্ত্তে পৌঁছে গেল যেন আর এক স্বপ্নের রাজ্যে। সওদাগরের দেশে।

ছেলেটার খিদে পেয়েছে। সার্টের পুটলি খুলে এক-দুই করে গুণে দেখল কাল রাত্তিরে মা'র হাঁড়িতে হাত ঢুকিয়ে যে এক খাবলা টাকা এনেছিল তাতে বার টাকা উঠেছে। তবু সাহস হয় না এখানকার কোনো একটা দোকানে ঢুকে কিছু একটা কিনে খায়। কে জানে কোন দিক থেকে কে কি বলবে! হয়ত বা ঘাড় ধরে দিলেই বের করে।

ছেলেটা মনের কথা চেপে ভিড়ের মধ্যে পায়ে পায়ে বেড়ায় ঘুরে। হাঁ-করে দেখে এটা ওটা সেটা। হঠাৎ দেখল এক জায়গায় মুড়ি বিক্রী হচ্ছে। আহা! মনে হল এ যেন কত আপনার। এর মত পরিচিত জিনিস সে যেন এখানে আর একটিও দেখেনি। মিঠাই-মণ্ডা ফেলে শিবতলির ছেলেটা অমনি তিন পয়সার মুড়ি কিনে কোঁচড় ভরে নিল।

এমন সময় ধোঁয়া উড়িয়ে ভোঁ বাজিয়ে গোয়ালন্দের ষ্টীমার একেবারে দৈত্যের মত এসে ভিড়ল জেটিতে। এইবার সুরু হল যাকে বলে ঠেলাঠেলি, ধাক্কাধাক্কি, চিৎকার। হোটেলের দালালরা হরেক রকমের চিৎকার জুড়ে দিল। যাত্রীরা কোন হোটেলে খাবে ভাল—কোথায় গেলে সুখে-স্বচ্ছন্দে ঘুমতে পারবে। কুলিগুলি পড়ি কি মরি করে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল ষ্টীমারে। একদল নামতে চাইছে, আর একদল ঠেলে ধাক্কিয়ে উঠছে। নাম ধরে ডাকছে একে তাকে। জিনিসপত্রের ঠোকাঠুকি। ষ্টীমার দাঁড়িয়ে আছে ষ্টীমারের মত।

পাড়াগাঁয়ের ছেলেটা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে। এরা কোথায় চলল? কোন দূর দেশে? সামনে দৈত্যের মত এই বিশাল জিনিসটাকে যত দেখে ততই যেন ছেলেটার মনে আরো আরো দূরের ছায়া এসে পড়ে। এরা না জানি কত দূরেই না চলল।

ছেলেটা তামাসা দেখে আর নানা কথা ভাবে। সেখানে নিশ্চয়ই কেউ বলবে না, গান-বাজনা ফেলে তুই পড়্। এখন যদি ফিরে যেতে হয় শিবতলি, কি দুর্দ্দশাই না হবে তা হলে।

ছেলেটা এদিক-ওদিক চাইতে চাইতে পায়ে পায়ে গিয়ে উঠে পড়ে ষ্টীমারে। একসময় ভোঁ বাজিয়ে ষ্টীমারটা নড়ে চড়ে উঠল। শীতলক্ষার জল উঠতে লাগল ফুলে ফুলে। ক্ষণপরেই দেখা গেল সেই গল্পে পড়া মানুষের উপকারি ভাল দৈত্যের মত ষ্টীমারটা ক্ষুদে ছেলেটাকে পিঠে করে চলল অথৈ জলে পাড়ি দিয়ে।

॥ চার ॥

ঘর্ ঘর্, ঝম্ ঝম্, ঝপ্ ঝপ্। ষ্টিমার চলেছে। ষ্টিমারটা যখন বেশ কিছুটা চলে এসেছে তখন আলমের ভয়টা যেন একটু কমল।

এই নিরীহ গোছের ক্ষুদে ছেলেটা ষ্টিমার যাত্রী অনেকের নজরেই পড়ল। কখনো বা হাঁ করে ষ্টিমারের কলকব্জা দেখছে। কখনো বা দেখছে যেখানে ষ্টিমারের চাকার ঘায়ে জলগুলো ছিটিয়ে পড়ছে গুড়ো গুড়ো মুক্তোর মত, ঢেউগুলি ফুলে ফুলে মিলিয়ে যাচ্ছে দূরে। কখনো বা ষ্টিমারের রেলিং ধরে একা একা চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে ঐ দূরে তীরের সবুজে পাড় দিয়ে ঘেরা আকাশের ঘন নীল ছায়ার দিকে চেয়ে।

যাত্রীরা কেউ ভাবল, ও তাঁর সঙ্গে এসেছে। কেউ ভাবল, ও ওঁর সঙ্গে এসেছে। সবাই ধরে নিল আলম কারো না কারো সঙ্গে এসেছে। তাই কেউ কিছু বলল না। ও রইল ওর মত। ষ্টিমার এসে পড়ল দু'কূল ছাপানো বিশাল পদ্মানদীর বুকে।

আলমতো এসে উঠেছে ষ্টিমারে। কিন্তু টিকিট করা নেই—কিছু নেই। গেঁও ছেলেটা জানেও না, লঞ্চ বল, ষ্টিমার বল—এ সব চড়তে গেলে টিকিটের দরকার হয়। তখনকার দিনে বুঝি টিকিটের অত কড়াকড়ি ছিল না, তাই বাঁচোয়া।

ষ্টিমার যায়, যায়, যায়। সারাটা দিন গেল। বিকেল গেল। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে হল। পেরিয়ে এল কত আম জাম কাঁঠাল গাছে ঘেরা গাঁ। কত বাঁশের ঝাড়। মাঝে মাঝে তাল সুপারি রয়েছে মাথা উঁচিয়ে। সারি সারি, ছাড়া ছাড়া। ষ্টিমার চলেছেতো চলেইছে। ঘর ঘর, ঝম্ ঝম্, ঝপ্ ঝপ্।

কখনো সখনো ভোঁ বাজিয়ে ঘন্টি দিয়ে কুলে ভিড়ে। তখন তীরের লোকজনের কোলাহল শোনা যায়। কিছু লোক ওঠে, কিছু লোক নেমে যায়। ছোট ছোট ডিঙি নৌকো করে সওদা নিয়ে আসে ব্যাপারীরা, খাবার, মিঠাই। ষ্টিমারের গায়ে গায়ে ঘুর ঘুর করে। দূরে পদ্মা বক্ষে নৌকোর আলোগুলি দুলতে দুলতে মিলিয়ে যায় দূরে।

কখনো সখনো বা পদ্মার বুক থেকে ভেসে আসে মাঝিদের মন উদাস করা ভাটিয়ালী গান। "মন মাঝি তোর বৈঠা নেরে, আমি আর বাইতে পারলাম না।" ও গানের সুর শুনে ছেলেটা চঞ্চল হয়ে ওঠে। ছুটে আসে রেলিং-এর ধারে। বাতাসে কান পেতে থাকে। হয়ত ষ্টিমারটা ঠিক তখনই ভোঁ বাজিয়ে ঘরঘরিয়ে ওঠে। তলিয়ে যায় সুর। আবার যাত্রা হয় সুরু। একটা বলতে না পারা ব্যাথা আলমের বুকে আকু পাকু করে মরে। বড় দুঃখ তার।

সারাদিন গেছে, বিকেল গেছে, সন্ধ্যেও পার হয়ে গেল। এই রাত্তির। ঘর ছাড়া, মা ছাড়া। ওদিকে ছেলে হারিয়ে শিবতলিতে মা-এর প্রাণ যে কি বলছে। এই সারাটা দিন মাথা বড় ক্ষুদে

ভাইটির কোন খোঁজ না পেয়ে মধুমালতী দিদির বুকে কি তোলা পাড়াই না হচ্ছে। মা, মধু দিদি—ওঁদের কথা ভেবে যেন দ্বিগুন অভিমান হল ছেলেটার। "ওঁরাতো কেউ আমাকে গান বাজনা করতে দেবেনা। আমি কেন যাব? কেন ফিরব শিবতলিতে?" ছেলেটা জানতেও পারলে না বাড়িতে তাকে হারিয়ে ওরা যে হায় হায় করে চোখের জল ফেলছে।

ভোঁ বাজিয়ে ঘন্টি দিয়ে গোয়ালন্দের ষ্টিমার ঘাটে ষ্টিমার এসে ভিড়ল। এবার ষ্টিমার খালি করে সব যাত্রীরা গেল নেমে। দেখা দেখি আলমও নেমে এল। ষ্টিমার থেকে নেমে ভিড়ের মধ্যে পায়ে পায়ে কিছু দূর এসে এবার যে জিনিষ দেখল তা সে তার এই আট বছরের জীবনে কোনোদিন কল্পনাও করেনি। দেশে গায়ে এর নামও শোনেনি কোনো কালে। সবাই বলল, এই নাকি রেলগাড়ী। যত দেখে তত অবাক মানে। দেখতে দেখতে সময় কাটে। কখনো বা গাড়ীর নীচে উঁকি মেরে দেখে, কখনো বা গাড়ীতে চড়ে বসে। এবারও টিকিট করার বালাই নেই।

যাত্রীরা একে একে গাড়ীতে উঠে আসে। বিছানাপত্র বিছিয়ে কেউ শুয়ে পড়ে, কেউ কেউ বসে বসে গল্প গুজব করে। গাড়ি যখন ছাড়ল, আলমও তখন রয়ে গেল গাড়িতেই। বাড়ির চিন্তা, দুঃখের ভয় ভাবনা রইল পেছনে পড়ে। দূরে—আরো দূরে। এই প্রথম রেলগাড়ি চড়ার কথা আলম জীবনে ভুলতে পারেনি। গাড়ি ছুটল, যেন উড়িয়ে নিয়ে চলেছে।

॥ পাঁচ ॥

আর একটা রাতও পার হল। আলম মা ছাড়া, ঘর ছাড়া। সারাটা রাত কাটল রেল গাড়িতে, ভিন দেশের যাত্রীদের মধ্যে। ভোরের দিকে আলমের ঘুম যখন ভাঙল, তখনো গাড়ি ছুটেছে, ঝক্‌ঝক্ ঝক্‌ঝক্ ঝক্‌ঝক্ ঝক্‌ঝক্......

অন্ধকার ফিকে হয়ে এল একটু একটু করে। ধোঁয়া ধোঁয়া আঁধারে পৃথিবী যেন একটু একটু করে জেগে উঠছে। গাছপালা ঘরবাড়ি যেন চোখের নিমেষে ছুটে দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে। ছায়া জড়ানো বড় বড় মাঠ-খামারগুলো যেন কেমন পাকিয়ে পাকিয়ে লম্বা হয়ে হয়ে সরে সরে যাচ্ছে দূরে। জানালা দিয়ে গাড়ির নীচের দিকে চাওয়া যায় না। পাথরের টুকরোগুলো যেন সরু একফালি ঘোলার জলের বন্যা। বেগে ছুটে যাচ্ছে পেছনের দিকে। বেশিক্ষণ চেয়ে থাকলে মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করে।

এই দুই দিনে কত কি ঘটে গেল আলমের জীবনে! অজ পাড়াগাঁ শিবতলির ছেলে আলম। চেনার মধ্যে চিনত নিজেদের গাঁ আর মধুমালতী দিদির শ্বশুর বাড়ির গাঁ। এই নিয়ে ছিল তার দুনিয়া। কখনো সখনো দাদাদের সঙ্গে গেছে ভিন গাঁয়ের মেলায়। সেই ছেলে আজ দুই দিন মা ছাড়া, ঘর ছাড়া। মধুদিদি নেই কাছে। একটা একটা করে জায়গা পার হয়, আর যেন একটু একটু বড় হয় তার দুনিয়া।

গান শোনার নেশায় কি পাগলই যে হল ছেলেটা। কোথায় ছিল কোথায় এসে পড়েছে। গাড়ির ঝক্‌ঝকানি যেন একটি কথাই ঝক্‌ঝক্ ঝক্‌ঝক্—করে ছেলেটার কানে বাজছে বারবার, "কতদূরে কতদূরে, আরো দূরে আরো দূরে—"

যায় যায়। প্রথম সূর্যের নরম আলো ছড়িয়ে পড়ল সোনালী আভায়। হঠাৎ যেন হুড়মুড় করে গাড়িটা এসে ঢুকে পড়ল মস্ত একটা প্রায় অন্ধকার ঘরের মধ্যে। ছেলেটা একেবারে ভ্যাবাচ্যাগা খেয়ে গেল। এই শিয়ালদ ষ্টেশন।

গাড়ি থেকে সবাই নামছে। ও'ও নামল। চারদিকে দেখে-শুনে হতভম্ব। এবারও বুঝি ছোট বলে সবাই ওকে রেহাই দিল। কেউ টিকিট চাইলে না। এই আলমের প্রথম কোলকাতায় আসা।

কোলকাতার রাজপথে ঘোড়ায় টানা ট্রাম চলত, ইলেকট্রিকের বদলে জ্বলত গ্যাসের আলো। তখন কোলকাতার এই বিশাল রূপ ছিল না। কিন্তু যা ছিল, তাইবা এই গেঁও ছেলেটা কোথায় দেখেছে ?

সান বাধান পথ, গাড়ি-ঘোড়া,—কোঠা বাড়িগুলি দাঁড়িয়ে আছে সারি সারি। চারদিকে সব নতুন, সব আরেক রকম। নারায়ণগঞ্জের বন্দরকে আলমের তবু একটু চেনা-চেনা মনে হয়েছে, কিন্তু এ যেন একেবারে আলাদা, অন্যরকম। আলম হাঁ করে দেখে। লোকজনের কথাবার্ত্তাও যেন ভিন্ন প্রকৃতির। ভোরবেলাকার আলোয় হ্যারিসন রোডের মুখে চলতি লোকের ভিড়ে দাঁড়িয়েও আলমের কেমন মনে হল সে যেন একেবারে একলা। চারদিকে অচেনার মাঝে কেমন যেন মোচড় দিয়ে উঠল বুকের মধ্যে।

শিয়ালদ-র মোড় ছাড়িয়ে কিছু দূর আসতেই আলমের মতই ক্ষুদে ক্ষুদে একদল স্কুলের ছেলে লাগল তার পিছে। তারা বইপত্তর নিয়ে বুঝি তখন যাচ্ছিল স্কুলে। আলমের নিরীহ চেহারা, বোকা বোকা হাবভাব, উদলা গা দেখে ঠিক ধরেছে, ছেলেটা গেঁও। যেই ভাবা সেই কাজ। কেউ হয়ত মজা করে ওর কাছা ধরে টান মেরে পালিয়ে এসে দল বেধে হো হো করে তামাসা করে। আবার হয়ত কেউ ওর কান ধরে টান দিল। কিছুদুর যায় আবার হয়ত কেউ

পেছন থেকে ওর বগলে চাপা সার্টের পুটলিটা ধরে টান মারে। ছেলেটা পেছন ফিরতেই হয়ত আবার কেউ লাগে সামনে থেকে।

কাল থেকে ঐ তিন পয়সার মুড়ি ভিন্ন আর একটি দানাও আলমের পেটে পড়েনি। কাল থেকে একটু জল নেই পেটে। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে ছেলেটার। তার ওপর এই অত্যাচার। আলমের মুখে রা নেই। ভয়ে-দুঃখে শুধু চোখ দিয়ে জল গড়ায়। আর দু'হাতে আঁকড়ে ধরে তার শেষ সম্বল, সার্টের পুটলিটা।

বেশ কিছুদূর ছেলের দল তার পেছনে লেগে তবে রেহাই দিল। হ্যারিসন রোড ধরে ছেলেটা হেঁটে চলেছে সোজা পশ্চিম মুখে। তখন দিনের সূর্য একটু একটু করে পশ্চিমে ঢলে পড়ছে।

জল, মাটি, আর চোখ জুড়ানো শ্যামলিমায় আলমের জন্ম। ও ভাবতেও পারেনি দুনিয়াতে এমন দেশও আছে যেখানে পায়ের নিচে মাটি নেই। জল নেই কাছে ভিতে। এদিকে ওদিকে দেখতে দেখতে পথ হাঁটে। এখানে সেখানে একটা খানা ডোবাও কি মিলে না। তাও নেই! জলের তৃষায় ছেলেটার প্রাণ যায়।

ঘুরতে ঘুরতে এক সময় এক ডালপুরী দোকানের পাশ দিয়ে হঠাৎ নজরে পড়ল ঐ বিশাল ঘোলাটে গঙ্গাকে। ধীরে শান্ত ভাবে বয়ে যাচ্ছে। এপার থেকে ওপার দেখা যায় কি না যায়। জল দেখে ছেলেটা দিশাহারা হয়ে ছুটে গেল নদীর তীরে। আঃ! এ যেন দেখতেও ভাল লাগে। দু'হাতের আজলা ভরে জল তুলে মুখ ডুবিয়ে দিল তাতে। কিন্তু হায়, সঙ্গে সঙ্গে মুখটা বিকৃত হয়ে উঠল। নূতন মুখটা যেন পুড়ে যায়। পিত্ত জ্বলে যায়। সবটুকু জল বেরিয়ে এল ঠেলে। গঙ্গায় তখন বইছে লোনা জলের জোয়ার।

আলম এতক্ষণ ঠিক ছিল কিন্তু এবারে আর ঠিক থাকতে পারল না। শিবতলির জল, মাটি, মা, মধুদিদি, সবকিছুর জন্যে প্রাণটা একেবারে আঁকুপাকু করে উঠল। গঙ্গার তীরে বসে ছেলেটা কেঁদে ফেলল। মা, মাগো! মধুদিদি!

সামনে রয়েছে অথৈ জল। কিন্তু তুমি একফোটাও খেতে পারবে না। হায় হায় এ কোন দেশে এসেছে আলম।

ঐ ভাবে গঙ্গার ধারে আসলে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেল। ক্ষিদেয় পেট চো চো করছে। তখন গঙ্গার ধারে উড়িয়াদের করা চমৎকার ডালপুরী পাওয়া যেত। আলম তাই দু'পয়সার কিনে খেলো। কিন্তু তাতে জলের তৃষ্ণা দ্বিগুন হয়ে উঠল। শুকিয়ে গলা যেন একেবারে কাঠ হয়ে গেল।

॥ ছয় ॥

আলম গঙ্গার তীরে এক গাছের তলায় বসে গঙ্গার জলের দিকে চেয়ে থাকে, আর তার দু'চোখ বেয়ে টস্ টস্ করে জল গড়িয়ে পড়ে। একজনের জলের তৃষ্ণায় প্রাণ যায়, ওদিকে গঙ্গার ছোট ছোট ঢেউগুলি তার সমুখ দিয়ে বয়ে যায় ছপ ছপ করে। ও কূল দেখা যায় না!

চারিদিক অন্ধকার হয়ে আসে। কিছুই দেখা যায় না। গঙ্গার মাঝে জোনাকির মত নৌকোর আলো নেচে বেড়াচ্ছে। চারিদিকের সব কিছু যেন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। আলম কাঁদতে কাঁদতে শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে এক সময় ঐখানে ঐ গাছের তলাতেই ঘুমিয়ে পড়ল।

আলমের বেশ মনে আছে ঘুমোবার সময় সার্টের পুটলিটা তার সঙ্গেই ছিল। সেই যে কাল সেই কোন সকালে নারায়ণগঞ্জের ঘাটে তিন পয়সার মুড়ি কিনে খেয়েছিল তারপরে এই দুই পয়সার ডালপুরী, তাছাড়া আর একটি পয়সাও খরচ করেনি। এগারোটা রূপোর টাকা আর খুচরোগুলি পুটলি করে রেখেছিল সার্টের মধ্যে। সার্ট সুদ্ধ এবার তাও গেল। আলম সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখে সার্টও নেই, টাকাও নেই। চোরে চুরি করে নিয়েছে। এদিক ওদিক খোঁজে! আর কোথায়! যেটুকু সম্বল ছিল, গেল!

সার্ট, টাকা, খুইয়ে আবার নতুন করে শোক উথলে উঠল ছেলেটার। কে নিল? কোথায় গেল? কাকে বলবে? এই বিদেশ বিভূঁইয়ে কোথায় যাবে? উদাল গা, খিদের চোটে পেট চো চো করে। চোখের জলে ও পথ দেখে না। মা, মধুদিদি, শিবতলির জন্যে বুক ভরা ব্যথা গুমরে গুমরে ওঠে। ও কাঁদতে কাঁদতে গঙ্গার তীর ধরে হাঁটতে লাগল।

গঙ্গার ধার দিয়ে গদাইলস্করি চালে এক সেপাই যাচ্ছিল, সে থেমে তার হাতের লাঠিটা উঁচিয়ে হাঁকিয়ে উঠল, "এই খোকা ক্যায়া হুঁয়া ?"

দু'তিনবার প্রশ্ন করাতে আলম ভয়ে ভয়ে ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল "আমার বোঁচকা চুরি গেছে সিপাহীজী।"

সেপাই ভুরু কুচ্‌কে রইল।

আলমের মুখে সব শুনে এক গাল হেসে বলল, "ও তো যাবেই। এ কলকাত্তা শহর। ঘর কাঁহা?"

আলম বলল, "শিবপুর। সেই যে বুড়ো শিবতলা। মস্ত বড় হাওরের পাশ দিয়ে রাস্তা......তারপরে মানিক নগরের লঞ্চের ঘাটলা......"

"চল ব্যাটা থানায়।"

আলম ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে।

"ব্যাটা নাঙ্গা ফকির, পয়সা থাকবে কোথায়?" সেপাইটা কি ভেবে বিরক্ত হয়ে বললে, "আরে যা যা যেখান থেকে এসেছিস সেখানে সোজা চলে যা। মেলা বিরক্ত করিসনে। ভাগ।"

তখন সূর্য উঠেছে খাড়া মাথার ওপর। ও চলেছে উত্তর মুখী।

হাঁটতে হাঁটতে আলম এসে পৌঁছল নিমতলার শ্মশানঘাটে। সেখানে দেখলে তিন সাধু। মাথায় ঝাকড়া চুল, গায়ে ছাই ভস্ম মাখা। পরনে কাপড় আছে কি নেই। গলায় দোলে রক্ত জবার মালা, রুদ্রাক্ষের মালা হাতে। সামনে শ্মশানের পোড়া কাঠের স্তূপ। কেউ সিদ্ধি ঘুটছে, কেউ গাঁজা টানছে। পাশে এখানে ওখানে পড়ে আছে মরা মানুষের মাথার খুলি। বাতাসে ধোঁয়ার কটু গন্ধ।

কিছু সময় যায়, এটা ওটা দেখে, আবার ফিক ফিক কেঁদে ওঠে। আলমের এই চলেছে সারাটা পথ। ঐ ক্ষুদ্র ছেলেটাকে এখানে অমনি করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সাধুদের একজন ডাক দিল, না যেন হেঁকে উঠল, "কিরে ব্যাটা, কাঁদছিস কেন রে!"

দাড়ি-গোঁফের মাঝে সাধুটার চোখ দুটো যেন ধক্ ধক্ করে জ্বলে। আলম ভয়ে ভয়ে কেঁদে কেঁদে সব কথা খুলে বলল সাধুদের কাছে। সাধুরা নিজেদের মধ্যে কি সব বলাবলি করে তারপরে বলল, "খেয়েছিস?"

আলম ওর বড় মাথাটা এদিক ওদিক নেড়ে বলল "না।"

সাধুরা কি বুঝলে, বলল, "খোল তোর কাপড়। এখানে কাপড় রেখে গঙ্গায় তিন ডুব দিয়ে আয়।"

আলমের বুক করে দুরু দুরু। আবার কি হয়! কি হয়! কিন্তু এই শ্মশান ঘাটে, ঐ সাধুদের কথা অমান্য করে সে সাহসও নেই। জলের দেশের ছেলে আলম, জলকে ভয় করে না। গঙ্গায়

তিন ডুব দিয়ে আসে। সাধুরা তখন বলে, "হাত পাত।" আলম হাত পাতলে ছাই ভস্ম কি একটা জিনিস দিয়ে বলে, "খেয়ে ফেল।"

আলম তাই করে। তারপরে সাধুরা বলে, "এইবার কাপড় পরে সোজা চলে যা পূব দিকে। এদিক ওদিক বেঁকবিনে। মিলবে তোর খাবার। যাঃ।"

আলম এবার রওনা হল পূবমুখী সূর্য তখন গড়িয়ে গেছে পশ্চিমে।

॥ সাত ॥

সাধুদের কথা মত আলম পূব মুখো হাঁটতে হাঁটতে কত বাড়ী কত ঘর, কত মাঠ পার হয়ে এল, তার ইয়ত্তা নেই। কোথায় খাবার? কোথায় কি? পেটের মধ্যে দু'দিনের সেই রাক্ষুসে খিদেটা যেন আগের মত আর কামড়াচ্ছে না। কিন্তু এখন যেন সারা শরীরটাকে কুঁরে কুঁরে খাচ্ছে। হাঁটতে হাঁটতে দেহটা যেন একেবারে নেতিয়ে আসে। পা চলেনা। একবার আশা হয়, একবার নিরাশায় ডুবে যায়। চোখ ফেটে আবার জল আসে।

সূর্য ঢলে পড়েছে পশ্চিমে। পায়ের তলার সড়ক তেতে উঠেছে। উদাল গা সূর্যের তেজে পোড়ে। ছেলেটা হেঁটে চলেছে পূব মুখো।

যেতে যেতে নিমতলা ষ্ট্রীট ছাড়িয়ে এল। পার হয়ে গেল বিডন ষ্ট্রীটেরও কয়েকখানা বাড়ি। ডাইনে একটা মস্ত মাঠ, তারপর কয়েক পা যেতেই ডান হাতে দেখল মস্ত এক বাড়ির সামনে সান-বাঁধান চত্বরে দশে বিশে লোক বোসে খাচ্ছে। আলমের অমনি সাধুদের কথা মনে পড়ল। তারা তো বলেছিল, "এই পূব মুখো হেঁটে যা, তুই যা চাস মিলবে। যাঃ!"

যার বাড়ির সামনে ঐ লোকগুলি খাচ্ছিল তিনি তখনকার দিনে ও অঞ্চলের একজন ধনী ব্যক্তি, মশলাপাতি ডাল চাল নানা জিনিষের আড়তদার। চারিদিকে তখন তার নাম ডাক। তিনি যত রাজ্যের গরীব-দুঃখী লোককে রোজ দুপুরে একবেলা করে নিজের পয়সায় খাওয়াতেন। শহরের দরিদ্র ভিক্ষুকের দল—যাদের কোথাও খাবার জুটত না, তারা এসে এখানে এই ধনীর গৃহে একবেলা করে খেয়ে যেত।

গেঁও ছেলেটা কোলকাতার কতটুকু জানে? কতটুকু বোঝে? ভাবল, সাধুদের কথাই বুঝ ফলে। দুদিনের পরে খাবার পাবার আশায় দুলে উঠল বুক। ভয়ও আছে। এদিক ওদিক দেখতে দেখতে পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে শহরের দরিদ্র ভিক্ষুকের মধ্যে আলমও পাতা নিয়ে বসে পড়ল। খেলেও দেদার। যা দিল তাই খেল।

দুদিন পরে এমনি অদ্ভুতভাবেই আলমের খাবার জুটল। কোলকাতায় যে কত অদ্ভুত অদ্ভুত কাণ্ড-কারখানা আলমের কপালে আছে তা আর ব'লে শেষ নেই। খাওয়া শেষ হতেই আলম দেখল আর এক অবাক কাণ্ড! জলের কল। রাস্তার পাশেই রয়েছে। টিপ দিলেই জল পড়ে। গেঁও ছেলে জন্মেও দেখেনি এ কাণ্ড। হায় হায়, এই একটু খাবার জলের জন্যে তাকে কত দুঃখই না ভোগ করতে হয়েছে। অথচ কোলকাতার পথে পথেই রয়েছে কল। ও জানতও না। সকলের দেখাদেখি আলমও দুহাত ভরে জল খেতে লাগল। পেট ফাটে। তবু জল খেয়ে যেন আশা মেটে না। প্রাণ ভরে জল খেল।

তখন দিন বড় বাকি ছিল না। খাওয়া শেষ হতে হতেই বেলা পড়ে এল। একটু একটু করে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। আলমের

যেখানে খাবার জুটেছে তার উল্‌টো দিকেই ছিল বর্দ্ধমানের কেদারনাথ ডাক্তারের বাসা। আলম তার সান বাঁধান বারান্দায় উঠে এক ধারে চুপ করে বসে রইল। ক্ষুদে ছেলেটার কাছে সবকিছুই যেন কেমন অদ্ভুত ব'লে মনে হতে লাগল। কোথায় ছিল, দুটি দিনের মধ্যে কোথায় এসে পড়েছে। সব কিছুই যেন একটা মস্ত স্বপ্ন দেখার মত। দুদিন ঘুরে পেটে খাবার পড়েছে। আলস্যে ঘুমে আলমের দুচোখ ঢুলু ঢুলু হয়ে উঠল। বসে বসে কেমন মনে হতে লাগল এসব যেন কিছুই ঘটেনি। এ কিছুই নয়। কিছু না। এমনি। মিছেমিছি। যেমনি ছিল তেমনি যেন সব কিছু আছে। শুধু আঁধারে মিশে আছে চারিদিক। মধুমালতী দিদি হয়ত এতক্ষণে গোয়ালে কচি বাছুরটাকে দুধ খাইয়ে ফিরছে ঘরে। মা হয়ত প্রদীপ নিয়ে অন্ধকারে বেরিয়েছে তাকে খুঁজতে। ফেনকচুর ঝোপের ওপর দিয়ে মুখ তুলে দেখছে, আর ভুরু কুচকে বলছে, "ছেলেটা গেল কোথায়!"

এমন সময় দূরে নিমতলার শ্মশান ঘাটে শিয়াল ডেকে উঠল। মন্দিরে বেজে উঠল কাঁসর ঘন্টা। আলমের কানে বাইরের শব্দ গেল কি না গেল। শিবতলার অমনি সব কথা ভাবতে ভাবতে ডাক্তার বাবুর বারান্দায় ধূলোমাটির মধ্যেই টুপ করে কখন পড়ল ঘুমিয়ে।

* * * *

॥ আট ॥

আর একটি রাতও কাটল। এই নিয়ে বাড়ি-ঘর ছাড়া আলমের তু'দিন তিন রাত্তির কাটল বাইরে। আজকের এ সকাল হ'ল বিডন স্ট্রীটের এক গলিতে বর্দ্ধমানের কেদার নাথ ডাক্তারের বারান্দায়।

কাক ডাকল, রাস্তায় গ্যাসের আলো নিভিয়ে দিয়ে গেল বাতিওয়ালা। একটি তু'টি ক'রে লোক চলাচল শুরু হ'ল রাস্তায়। কমণ্ডলু হাতে, বগলে পাটের কাপড় নিয়ে গঙ্গাস্নানে চলেছে বুড়ো-বুড়ির দল। ছাতু বাবুর বাজারের শাক-সব্জীওয়ালারা আর মেছুনীরা ছুটছে তড়বড় করে। পূণ্য লাভের আশায় তু'একজন রাস্তায় খাবার ছড়াচ্ছে কাকের জন্যে।

আলম বেরিয়ে এল রাস্তায়। সারা সকালটা ঘুরল এদিক ওদিক এটা ওটা দেখে। যেন কোনো উদ্দেশ্য নেই, কিচ্ছু নেই। কিন্তু তার মনের ইচ্ছা মনেই রয়েছে। কাকে বলবে? কে বুঝবে তার কথা? এই মাথা-মড় আটবছরের নিরীহ ক্ষুদে ছেলেটার দিকে কেউ মুখ তুলেও দেখেনা। একা একা ঘুরে বেড়ায়। সন্দেহ হলেই এ বাড়ি ও-বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে কান খাড়া করে শোনে যদি ভেতরে গান-বাজনা কিছু শুনতে পায়! কিন্তু কই! বাসন মাজতে মাজতে ঝির বকবকানি আর দাঁতন-চিবোনো বাবুর কাসির আওয়াজ ছাড়া কিছুই এলোনা তার কানে।

আলম আজকেও সেই ধনীর গৃহের সামনে সান বাঁধান চত্বের শালপাতা বিছিয়ে শহরের দরিদ্র ভিখারীদের সঙ্গে বসে খেয়ে নিল। সঙ্গে যা ছিল সে পুঁজিতো আগেই গঙ্গার ঘটে খোয়া গেছে।

রাত্রে দুপুরে সকাল সন্ধ্যায় কোনো সময়ইতো কোথাও আর একটি দানাও পেটে পড়ার জো নেই। যা কিছু জোটে এই এক বেলা।

গত কালকের মত আজও খেতে খেতে বেলা পড়ে এল সন্ধ্যা গড়িয়ে এল। রাস্তায় একটি দু'টি করে জ্বল্‌ল গ্যাসের আলো। বেলফুলের মালা হেঁকে গেল মালী। জুড়ি গাড়ী হাঁকিয়ে চলেছেন সৌখীনবাবু, সহিস চলেছে আগে আগে, হেঁড়ে গলার হেঁকে রাস্তার পথচারীদের সাবধান করতে করতে। আস্তে আস্তে রাত্রি গভীর হল। বিডন ষ্ট্রীট ফাঁকা হয়ে গেল। চারিদিক নির্জন।

যখন কাছে-ভিতে কেউ কোথাও রইল না, তখন আলম কালকের মত আজকেও পায়ে পায়ে গিয়ে সেই ডাক্তার বাবুর বারান্দায় শুয়ে পড়ল। ফাঁকা মন আর হতাশা নিয়ে কখন এক সময় সে ঘুমিয়ে পড়ল।

আর একটা রাতও গেল।

এমনি করে রাত যায়, সকাল হয়, সন্ধ্যা আসে, আবার রাত পার হয়। দিনের গায়ে দিন চলে পড়ে। আলম এক বেলা করে ঐ ধনী ভদ্রলোকটির খায় আর একবেলা ঐ সরকারী কলের জল আর নির্জ্জন নিশুতে রাতে গিয়ে কেদারনাথ ডাক্তারের বারান্দায় ঘুমায়। সকাল সন্ধ্যা কোলকাতার পথে পথে ঘুরে বেড়ায় সুরের সন্ধানে। এমনি করে দিন যায়।

একদিন তখন বিকেল পড়ে এসেছে, সন্ধ্যা হ'য়েছে কি হয়নি! আলম আর সেদিন কোথাও বেরোয় নি। কেদারনাথ ডাক্তারের বাড়ির আশে পাশেই ঘুরঘুর করছে। হঠাৎ তার কানে গেল ডাক্তারবাবুর বাড়ির মধ্যে কিসের যেন বাজনা সুরু হয়েছে। এই প্রথম একটু বাজনার আভাস পেয়ে ছেলেটার বুকের মধ্যে কেমন যেন করে উঠল! যেন বিশ্বাস হতে চায় না। সত্যি কি সে

বাজনা শুনছে? বাজনা! পায়ে পায়ে ও এগিয়ে যায় বাড়ির দিকে। বারান্দায় উঠে চুপিসাড়ে কান পেতে থাকে। এই একটু গানবাজনা শোনার জন্যে, শেখার জন্যে ছেলেটা দিনের পর কি না সয়েছে! মা ছেড়েছে, বোন ছেড়েছে, দেশ ছেড়েছে—

ভেতরে বাজছিল পিয়ানো তখনকার দিনে ধনীদের মধ্যে যারা ইংরেজী লেখা-পড়া শিখে শিক্ষিত হচ্ছিল, তাঁদের মধ্যে ইংরেজী গানবাজনার দিকে ছিল একটা প্রবল ঝোক। বিদেশী বিশেষ ক'রে ইওরোপীর গান শিখে তাকে আমাদের মত করে গাইবার চেষ্টাও হয়েছে বিস্তর। সে সব গান তখন চল্‌তও খুব। "ছি ছি এত্তা জঞ্জাল, এত্তা বড়া বাড়িমে এত্তা জঞ্জাল"—

এই ধরণের গান শিক্ষিত ধনী বাবুদের ঘরে ঘরে, আজকালকার আধুনিক গানের মতই ছিল চালু।

কেদারনাথ ডাক্তার ছিলেন এসব গানের বড় ভক্ত। বিদেশী বাদ্য যন্ত্র পিয়ানো ছিল তার। তার ছেলেমেয়েরা বাজাত বাড়িতে। সময় পেলে তিনি নিজেও বাজাতেন। তখন হয়ত তাদের মধ্যেই কেউ পিয়ানো বাজাচ্ছিল। আলম তাই শুনতে পেলে।

বারান্দায় উঠে, দোরের পাশে দাঁড়িয়ে তন্ময় হয়ে শুনতে লাগল। সময় গেল। ছেলেটা এমন তন্ময় হয়ে শুনছিল যে বাজনা যে কখন থেমে গেছে খেয়াল হয়নি তার। সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। হঠাৎ সুধা-ঢালা কার মধুর কণ্ঠ ছেলেটার কানে বাজল, "কিরে এখানে কি চাইছিস রে?"

ছেলেটা যেন হঠাৎ অভয় পেয়ে মুখ তুলে চাইল। যেন মূর্ত্তিমতী মা দাঁড়িয়ে আছেন সামনে। মা ছাড়া কোলকাতার এই রুক্ষুসুক্ষু দেশের একটুখানি স্নেহের স্পর্শেই ছেলেটার বুক যেন উঠল দুলে। চোখ ফেটে জল আসতে চাইল।

মা আবার শুধালেন, "কি চাইছিস রে?"

॥ নয় ॥

কি কষ্টেই না আলমের এতগুলি দিন কাটল! বাইরে বাইরে। ঘর ছাড়া দেশ ছাড়া! এক বেলা কলের জল আর এক বেলা ঐ খয়রাতি খাদ্য খেয়ে। তাও জোটে কি না জোটে। তাও ছিল যেমন তেমন কিন্তু সন্ধ্যা হলে যখন মন্দিরে বেজে ওঠে কাঁসর ঘণ্টা, অনেক দূরে শেয়াল ডাকে, তখন মা, মধুমালতী দিদি, বুড়ো শিবতলার কথা মনে পড়লে বুকের মধ্যে কেমন যেন করতে থাকে!

এমনি গেল কতদিন! এক দিনের তরে মুখের কথা খরচ করেও কেউ শুধোয়নি। তাই কেদারনাথ ডাক্তারের স্ত্রীর ঐ সুধা-মাখা কথা শুনে বুক-ভরা অভিমান নিয়ে ছেলেটা বলে উঠল, "আমি বাজনা শুনতাম আইছি।"

"বাজনা শুনবি?" কথাটা মা-র যেন কেমন অবাক লাগল। ফের শুধালেন, "কোথায় থাকিসরে তুই?"

একটু স্নেহের স্পর্শ পায় আর ছেলেটার আবেগ যেন উথলে ওঠে, এক কথায় কত কথা বলে যায়। যেন আপনজনের কাছে নির্ভয়ে দিচ্ছে নিজের পরিচয়। ছেলেটার অজ পাড়াগেঁয়ে পূর্ব্ববঙ্গের ভাষা। ওর কথাগুলির মোটামুটি অর্থ দাঁড়ালো এই—"আমি সেই শিবতলি থেকে এসেছি ঐযে মানিকনগর শ্যামগঞ্জের লঞ্চের ঘাট, তারপরে মস্ত হাওর, হাওরের পাশ দিয়ে পথ গিয়েছে বেঁকে, মস্ত শিমূল গাছ, তারপরে বুড়ো শিবতলা। ঐযে গো যেখানে সন্ন্যেসীরা গান গায়, বাজনা বাজায়, সেই যে শিবতলি—ওখানে গিয়েই তো আমি গান বাজনা শুনতাম। মা বলল, ছেলেটা বড় হলে ডাকাত হবে, হাত পা বেঁধে ওকে রাখ ঢেঁকি ঘরে। মধুদিদি

আমার হাতের পায়ের বাঁধন খুলে দিয়ে বলল, ওকে ভাত দাওনি কেন ? সেই শিবপুর গ্রাম আমাদের।"

মা ছেলেটার কথা বলার ভংগী দেখেন আর কৌতুকে ঠোঁট টিপে মিটি মিটি হাসেন। মা তো কথা শুনেই বুঝলেন ছেলেটা এসেছে সেই যমুনার ওপারে পূর্ব্ববঙ্গের কোন দূর গাঁ থেকে। ওর ভাষা মা আধেক বুঝলেন, আধেক কথাতো বুঝতেই পারলেন না। শুধু কথার ভাবটা ধরে হেসে বললেন, "হ্যাঁরে তোর সঙ্গে আর কেউ আসেনি ?"

ছেলেটা অভিমান ভরে বড় মাথাটা নেড়ে বলল, "ওরা যে আমাকে গান শুনতে দেয় না ! বলে, পড়্।"

"তুই তাই চলে এলি ?"

"আমি গান শুনব।"

"গান !" মা-র অবাক হবার আর সীমা থাকে না। বললেন, "তুই গান শোনাবার জন্যে চলে এলি একা ! বাড়ি ঘরদোর মাকে ছেড়ে ?"

ছেলেটার মুখে রা নেই। শুধু চোখ দু'টি ওঠে ছলছলিয়ে। মা ফের শুধালেন, "এখানে থাকছিস কোথায় ? খাচ্ছিস কী ?

ওর থাকা খাওয়ার সব বৃত্তান্ত শুনে মা অধীর হয়ে বাড়ির ছোকরা চাকরটাকে ডেকে বললেন, "যাতো বাবা, ঐ মোড়ের দোকান থেকে কিছু কচুরি আর মিষ্টি নিয়ে আয়। দেরী করিসনিকো। আহা, কতদিন বেচারা বাড়ি ঘর ছাড়া। এক বেলা খেয়ে আছে।"

এই অদ্ভুত ক্ষুদে গান-পাগলার কথা শুনে বাড়ির ছেলে মেয়েরাও বেরিয়ে এল। মা বললেন, আগে ওকে খেতে দে বাছারা।"

মা-র প্রাণ, সব দেশেতেই সমান।

আলমকে পেট ভরে কচুরি খাওয়ালেন মা। খাওয়া শেষ হলে বাড়ির ছেলে মেয়েরা ঘিরে ধরলে আলমকে। বললে, "তুই যদি গান বাজনা শোনার জন্যে অতই পাগল, তবে তুই নিশ্চয়ই গান জানিস। একটি গান গেয়ে শোনা দিকি।"

ছেলেটা অমনি তার বড় মাথাটা নেড়ে গান ধরে দিল। মাঝিরা নৌকার বৈঠা-বাওয়া ছেড়ে দিয়ে শুধু হাল ধরে নদীর স্রোতের মুখে নৌকা ছেড়ে দিয়ে গায় যে মন উদাস-করা ভাটিয়ালা—আলমও গাইতে লাগল সেই গান, "কইও তুস্‌ক (দুঃখ) বন্ধুর লাগ পাইলে—"

আট বছরের ছেলে, অত কি বোঝে। বড়দের মুখে যে গান শোনে তাই সে ধরল। পূর্ব্ববঙ্গের ভাষার জন্যেও তার নেই কোনো সরম। আঁধারে ঢেকেছে চারিদিক। নৌকা যেন নদীর স্রোতে গা এলিয়ে ভেসে চলেছে কোন দূরে। মাঝিদের পরবাসের দুঃখ কথায় কথায় সুরে সুরে ছেলেটার কণ্ঠে ওঠে উচ্ছল হয়ে।

আলমের কচি রিনরিনে গলায় মিঠা সুরের মন উদাস-করা গান শোনেন আর মা-র মন ওঠে কেঁদে কেঁদে—না জানি কোন অভাগী মার বুক খালি করে ছেলেটা এখানে চলে এসেছে গো!

এমন সময় কেদারনাথ ডাক্তার এলেন। সব কথা শুনে তিনিও কম অবাক হলেন না। শুধালেন, "কিরে খোকা, তোর নাম কি?"

গৃহিণী বললেন, "ওগো ছেলেটার একটা গতি তুমি করে দাও!"

ছেলেটা জবাব করলে, "আমার নাম আলাউদ্দিন খাঁ। আমার মাথাটা বড় কিনা তাই সবাই আমাকে আলম বলে ডাকে।"

* * * *

॥ দশ ॥

গৃহিণীর অনুরোধ শুনে ডাক্তার বাবু বললেন, "আরে না না। আজকাল ছিচ্‌কে চোরে শহর ছেয়ে গেছে। ও এখানে কোন মতলবে এসেছে কে জানে। এই যা যা। ভাগ এখান থেকে।"

গৃহিণী প্রতিবাদ করে বললেন, "সবাই চোর হবে, তার কি কথা।"

আলমও বলল, "না না আমি চুরি করব না। আমি চোর নই। আমি খালি গান শুনতাম চাই।"

"আশ্চার্য!" ডাক্তারবাবু গৃহিণীর মুখের দিকে চেয়ে বললেন, "এই শহরে ও কোথায় থাকবে? খাবে কী?

গৃহিণী বললেন, "সে ব্যবস্থা আমার। কেন থাকবে আমাদের বারান্দার ঐ ছোট্ট চিলে কোঠায়। ওতো খালি পড়ে থাকে। ওকে বিমুখ করোনাকো। আহা দেখো দেখো ওর করুণ মুখখানা। দুধের বাছা। পূর্ব্ববঙ্গের সেই কোন অজ পাড়াগাঁ থেকে এসেছে তা-কে জানে! এখানে কোথায় যাবে? কে দেখবে ওকে?

ডাক্তারবাবু বললেন, "কিন্তু এই গান পাগলা দুধের বাছার গান শেখবার উপায় হবে কি?"

তার জবাবে গৃহিণী বললেন, "কেন, সে ব্যবস্থা ওতো তুমি ইচ্ছে করলেই করতে পার। কোলকাতার কত বড় বড় গাইয়ের সঙ্গে তোমার জানা শোনা। ওর মত অমন মিঠে গলা আমিতো আর কোথাও শুনিনি বাপু।"

গৃহিণীর কথা শুনে আর আলমের নিরীহ গোবেচারি মুখের পানে চেয়ে ডাক্তারবাবুর মনে বুঝি দয়া হল। তিনি রাজি হলেন। বললেন, "আচ্ছা দেখি কি করতে পারি।"

গৃহিণী অনুনয় করে বললেন, "ওকে নিয়ে যাওনা কেন পাথুরে ঘাটা সৌরীন্দ্র মোহনের সভায়।"

কেদারনাথ ডাক্তার গৃহিণীর আবদার শুনে হতবাক। বলে কি? এ কথার কিছু জবাব করলেন না। চুপ করে রইলেন। সন্ধ্যার এই আলো-আঁধারে আলমের দিকে চেয়ে কি যেন ভাবলেন মনে মনে। এইটুকুন ছেলের গান-বাজনা শেখার এই অদ্ভুত আগ্রহের কথা একবার বিশ্বাস হয়, আবার যেন বিশ্বাসও হতে চায় না।

সেই রাত্তির থেকে কেদারনাথ ডাক্তারের বারান্দার চিলে কোঠায় আলমের থাকাব ব্যবস্থা হল। এই বিদেশ বিভূঁই-এ এর আগে রাস্তায়, গাছতলায় বারান্দায়—কতখানেই না আলমের রাত কেটেছে! এতদিন চুরি করে পরের বাবান্দায় শুয়েছে তার জন্যে কে কোন দিক থেকে গালমন্দ করে, তাব মধ্যে রাত্তিব অন্ধকারে নাকি বেবোয় ভূত-প্রেত-জীনপবী– এমনি কত অজানা ভয়ে কতদিন যে ওর দেহে কাঁটা দিয়ে উঠেছে তার ইয়ত্তা নেই। গৃহিণীর দয়ায় এই প্রথম কোলবাতার কোনো ঘরে ঢুকতে পেল আলম। শোবার ঠাঁই পেল ঘরে। চুরি করে, পরের বারান্দায় ঘুমোবার ভয় আর নেই। সে রাতটা কাটল ভালয় ভালয়।

তারপরের দিন সকালে বেরুবার মুখে কি ভেবে কেদারনাথ ডাক্তার বললেন, "না, ছেলেটাকে নিয়েই যাই।" আলমকে ডেকে বললেন, ওরে খোকা, আলম না আলাউদ্দিন কি তোর নাম, চল দিকিনি আমার সঙ্গে।"

গৃহিণী সকাল বেলাকার আলোয় আলমকে ভাল করে দেখে বললেন, "উদাল গা, খালি পা, পরণের কাপড়টা কি হালইনা হয়েছে। একটু দাঁড়া বাবা।" তিনি বাড়ির ছেলেদের একটা বাড়তি জামা এনে দিয়ে বললেন, "যাবিতো এইটি পরে যা বাবা।" আলম তাই পরে বাবু হল।

ডাক্তারবাবু আলমকে নিয়ে বিডন ষ্ট্রীট ধরে এসে পড়লেন চিৎপুর রোডে। সেখান থেকে বাঁ হাতে চিৎপুর রোড ধরে এলেন পাথুরিয়াঘাটা। সামনেই রাজা সৌরীন্দ্র মোহন ঠাকুরের বাড়ি।

ত্রিপুরার শিবপুর গ্রামের ছেলে আলম। শিবপুর গাঁয়ে বড় বাড়ির মধ্যে গাঁয়ের জমিদার নবকৃষ্ণ চৌধুরীর বাড়িটাই তারা দেখেছে। বড় বাড়ি বলে গাঁয়ের লোকে কি ভয় ভক্তিই না করত তাকে। ও বাড়ির সামনে দিয়ে যেতেও যেন গাঁয়ের লোকের বুক কাঁপত। সেই গাঁয়ের ছেলে রাজা সৌরেন্দ্র মোহন ঠাকুরের বাড়ির কল্পনাও করতে পারবে না। আলমের মনে হল এ যেন মধুমালতী দিদির মুখে শোনা কোনো রাজপুত্তুরের বাড়ি। কি বিরাট বাড়িখানা। বাড়ির সামনে ফুলের বাগান। তেজি জুড়ি ঘোড়া গাড়ি নিয়ে বেরুলো টগবগিয়ে। গেটে উর্দ্দিপরা বন্দুকধারী দারোয়ান। সোনার বরণ পতাকা উড়ছে বাড়ির চূড়ায়।

ডাক্তারবাবুর সঙ্গে আলম ভয়ে ভয়ে তার ক্ষুদে ক্ষুদে চোখ দুটি টান টান করে হাঁ করে বোকার মত চারদিক ঘুরে ফিরে দেখতে দেখতে ঐ বাড়ির চত্বরের মধ্যে দিয়ে বাগানের ধার ঘেঁষে এগুতে লাগল ভেতরের দিকে। হঠাৎ তার কানে এল কোথা থেকে যেন ভেসে আসছে সুমধুর গানের সুর। মুহূর্ত্তে ছেলেটা চারিদিকের এই দৃশ্য দেখা ভুলে গেল মন প্রাণ যেন নিমেশে চলে গেল সেই গানের দিকে। কোন্ দিকে? কোথায় হচ্ছে? ভাল করে শোনার জন্যে যেন বুকের মধ্যে আঁকুপাকু করে উঠল।

হঠাৎ এই গানের সুর শুনে ছেলেটার মন ভরে উঠল খুশিতে। এ খুশির ভাব ভাষার কাউকে যায় না বলা। এ যেন আপনিই ওঠে বুক ভরে। পাঠশালায় পালিয়ে সেই বুড়ো শিবতলায় সন্ন্যেসীদের গান শোনার পরে এ যেন কত যুগ পরে আবার কানে এল গানের সুর। আলমের কেমন যেন মনে হতে লাগল এ সুর

যেন তার মনের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। এই-ই যেন সে খুঁজে বেড়াচ্ছিল —এ যেন সে নিজেই গাইছে।

যতই সে স্বর ঘনিয়ে এল কাছে ততই আগ্রহে উত্তেজনায় আলমের বুকের ধুকপুকানি বেড়ে গেল। একটা ঘরের দোরের সামনে দাঁড়িয়ে হঠাৎই যেন ডাক্তারবাবুর কথা আলমের কানে এল। তিনি বললেন, "এই খোকা, আলম না আলাউদ্দিন আয়।"

তখন সামনে এই ঘরের মধ্যে থেকেই পরিষ্কার ভেসে আসছে সেই সুর।

।। এগার ।।

আলম কিই-বা জানে! কোথায় এসেছে? ঐ ঘরের মধ্যে কে গাইছে অমন গান? কে রাজা সৌরীন্দ্রমোহন? তার "সভা গায়ক" কথাটার অর্থই বা কী?

কিন্তু কোলকাতার লোক তখন এক ডাকে চেনে পাথুরে ঘাটার এই রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়ি। জোড়াসাঁকোর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরদের একই বংশের লোক এঁরা। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-বাড়ীর লোকরা ব্রাহ্ম ধর্ম্ম গ্রহণ করেছেন আর পাথুরেঘাটার ঠাকুরবাড়ির এঁরা হিন্দুই রয়ে গেছেন। এই ঠাকুর বংশের এই দুই ধারা। নামে-ডাকে এই দুই বাড়ির লোকরাই তখন বাংলা দেশের সেরা নামজাদাদের মধ্যে।

রাজা সৌরীন্দ্রমোহনের যেমন বিরাট জমিদারী ছিল, তেমনি ছিল সৌখীন মেজাজ। গান-বাজনার দিকে ছিল তাঁর প্রবল ঝোঁক। এমনিতেও তিনি ছিলেন খুব শিক্ষিত। কোথাও কোনো ভাল গাইয়ে-বাজিয়ের সন্ধান পেলে সম্ভব হলেই তাকে নিয়ে আসতেন

তাঁর রাজসভায়। কাউকে বা খাওয়া পরা দিয়ে নিজের বাড়িতেই আদর করে রাখতেন, কেউ-বা মাস গেলে বেতন পেত। কোনো জ্ঞানী-গুণী গুণের বিশেষ কিছু দেখাতে পারলে তাঁর কাছ থেকে পেত পুরস্কার। সাধারণ মানুষের শিক্ষার জন্যে বাংলা দেশে তিনিই প্রথম গানের ইস্কুল খোলেন। রাজা সৌরীন্দ্রমোহনের বাড়ীটা যেন সদাসর্ব্বদাই হয়েছিল একটা গানবাজনার আখড়া।

যেমন দেশে তেমনি বিদেশেও ছিল তাঁর নাম। ইওরোপের লোকরাও তাকে মানত গুনী সঙ্গীতজ্ঞ বলে।

আলম অত সব কথার কী জানে? কেদারনাথ ডাক্তার কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন, কেন নিয়ে যাচ্ছেন—এ সব কোন কথাই ছোট বলে ওকে খুলে বলেননি।

আলম এমন ভারী এমন গম্ভীর অথচ মোলায়েম গলার গান জীবনে শোনেনি। অনেকটা ঢোলের মত দেখতে মৃদঙ্গের বোলের সঙ্গে এ যেন তালে তালে দুলছে। গানের সুরে সুরে যেন সমস্ত ঘরটা ভরে গেছে। উপচে পড়ছে ঘর ছাপিয়ে। এ সুর যেন হাত দিয়ে ছোঁয়া যায়।

কেদারনাথ ডাক্তার নিঃশব্দ ইঙ্গিতে আবার আলমকে ডাকলেন, "আয় আমার সঙ্গে"।

আলম ঘরের এককোণে দাঁড়িয়ে এবার দেখতে পেল গায়ককে। কে গাইছে অমন গান? দেখে শুনেও এই পাড়াগাঁয়ের ছেলেটা ঐ গায়কের নাম জানে, না বলতে পারে!

কিন্তু তখনকার দিনে কোলকাতার যারা একটু গানবাজনা সম্বন্ধে খোঁজখবর রাখে তারা কে না শুনেছে গোপালকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের নাম। যার বাংলার বাইরে অন্যান্য প্রদেশেও রয়েছে খ্যাতি!

আলম মুগ্ধ হয়ে শোনে আর চেয়ে চেয়ে দেখে, গোপালকৃষ্ণ যেন ধ্যানে বসেছেন। ঝন্—ন্, ঝন্—ন্, শব্দ হচ্ছে তানপুরায়।

সঙ্গের মৃদঙ্গবাদক ঘন-ঘন মাথা নাড়ছে মৃদঙ্গের বোলের সঙ্গে সঙ্গে। গোপালকৃষ্ণ দু'চোখ বন্ধ করে মৃদু মৃদু মাথা দোলাচ্ছেন। কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসছে সেই অপূর্ব্ব সুর। আলম লক্ষ্য করলে,—কিন্তু তার হাত দুটো যেন কেমন অদ্ভুতভাবে কাঁপছে থরথরিয়ে। হাতদুটি প্যাঁকাটির মত কেমন যেন সরু খাটো খাটো। আলম তো আর জানে না গোপালকৃষ্ণের এই পক্ষাঘাতগ্রস্ত অসাড় হাতদুটির জন্যেই সবাই তাকে ডাকে "নুলো গোপাল" বলে। "নুলো গোপাল" নামেই তিনি পরিচিত।

গোপালকৃষ্ণ গান শেষ করে চোখ মেলে চাইলেন। যেন ধ্যান ভেঙে চোখ মেলে চাইলেন সাধু। অমনি ডাক্তারবাবু এগিয়ে গেলেন গোপালকৃষ্ণের কাছে। আলম চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল এককোণে। ওর কানে যেন তখনও গুমগুম করে বাজছে সেই গানের সুর।

ডাক্তারবাবু গোপালকৃষ্ণের সঙ্গে কি নিয়ে যেন কথাবার্ত্তা শুরু করলেন আর মাঝে মাঝে আলমকে দেখিয়ে কি যেন বলাবলি করতে লাগলেন দু'জনে। কিছুক্ষণ পরে গোপালকৃষ্ণ আলমের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে চেয়ে ভাল করে দেখে নিয়ে বললেন, "সত্যি"! তারপরে আলমের দিকে তেমনিভাবে চেয়েই ডাকলেন, "আয় তো খোকা এদিকে"। আলমের তখন পা কাঁপছে। ডাক শুনে অকারণে কেন যেন বুকের মধ্যে টিপ্‌টিপ করে উঠল। ভয়ে ভয়ে এগিয়ে গেল ছেলেটা।

* * * *

॥ বার ॥

কাঁপতে কাঁপতে কোনোমতে আলমতো এগিয়ে গেল। রাজা সৌরীন্দ্রমোহনের গানের সভার চারদিকে কতরকমের যে বাদ্যযন্ত্র থরে থরে সাজান রয়েছে। দেয়ালে বড় বড় ছবি। ঝক্ ঝক্ করছে তাদের ফ্রেম, যেন সোনা মোড়া। গালিচাপাতা ঘরের মেঝেতে। গোপালকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য মাঝখানে বসে। চারদিকে বিপুল বৈভব।

আলম কাছে গেলে গোপালকৃষ্ণ বললেন, "গান শিখতে চাস?"

আলম মাথা নেড়ে জবাব দিল "হ্যাঁ"।

গোপালকৃষ্ণ বললেন, "তোকে একমনে বার বছর কেবল স্বর সাধনা করতে হবে। গলা ঠিক করার জন্যে দিনরাত কেবল সা-রে-গা-মা করতে হবে। অন্যদিকে মন দিলে চলবে না। পারবি?"

এবার আলম তার বড় মাথাটা কাৎ করে বলল, "হ্যাঁ।"

গোপালকৃষ্ণ আট বছরের এইটুকু ছেলেটার আগ্রহ দেখে খুশি হয়ে বললেন, "বেশ, কাল থেকে রোজ আসবি আমার কাছে। তোকে শেখাব আমি।"

সেই থেকে আলমের সুরু হল গান বাজনা শেখার সাধনা। তার পরের দিন সকালেই আলমকে এক ধারে একটি তানপুরা দিয়ে আসন পিঁড়ি করে বসিয়ে প্রথমে তানপুরার চারটে তারকে আঙ্গুল টেনে টেনে এক দুই তিন চার করে পর পর বাজাতে শেখালেন। কোন আঙ্গুলে কোন তার বাজবে। ডান হাতে তানপুরা ছাড়ে, বাঁ হাতে তবলার বাঁয়ায় তাল বাজায়। সেই সঙ্গে দু'পা দিয়ে কি করে তাল-মাত্রা একই সঙ্গে ঠিক রাখতেহয় তাও শেখালেন একে একে।

সে এক অসীম ধৈর্য্যের পরীক্ষা চলল আলমের। দিনের পর দিন যায়। আলম গোপালকৃষ্ণের পাশে বসে ঐ ভাবে তানপুরা বাজায়। গোপালকৃষ্ণ ওকে আর কিছুই শেখান না। গ্রীষ্ম যায় শীত আসে। শীতও পার হয়ে যায়। আলমের সাধনা চলে ঐ একভাবে। ঘুমোবার জন্যে রয়েছে ডাক্তারবাবুর চিলে কোঠা, খাবারের জন্যে রয়েছে সেই ধনীবাবুর বাড়ির খাবার। সেদিকে আলমের ভ্রুক্ষেপ নেই। সকালে বিকেলে ছেলেরা খেলে, আলমের সেদিকেও কোনো ঝোঁক নেই। গুরুর কথা তার ধ্যান জ্ঞান। গোপালকৃষ্ণ গান গায় ও তানপুরা বাজায় আর মুগ্ধ হয়ে গান শোনে। এমনি করে কেটে গেল চার চারটি বছর।

ওস্তাদি গান শেখায় যে কি অসীম ধৈর্য্য আর সময়ের দরকার তা গোপালকৃষ্ণ ভাল করেই জানতেন। একদিন আলমের মুখের দিকে চেয়ে মনে মনে খুশি হয়ে ভাবলেন, ছেলেটা ধৈর্য্যের পরীক্ষায় পাস করেছে। এবার সময় হয়েছে ওকে স্বর জ্ঞান দেবার, ভাল গান গাইতে হলে গোড়াতে গলার স্বর ঠিক হওয়া চাই। তার জন্যে সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি এই সাতটি স্বর ভাল করে অভ্যাস করা দরকার। আলমের এবার সুরু হল সেই গলা তৈরি করার সাধনা।

গোপালকৃষ্ণ দিনের পর দিন গলা ঠিক করার নানা রকমের পদ্ধতি ছেলেটিকে শেখাতে লাগলেন। হরেক রকম করে সা-রে-গা মা-পা-ধা-নি-সা সুর করে বলতে অভ্যাস করাতে লাগলেন। যেমন সারেগা, রেগামা, গামা-পা...তার পরে সারে, রেগা, গামা,...তার পরে সাসা, রেরে, গাগা, মামা...এমনি না-না ধরনে ৩৬০ রকমের গলা সাধার পদ্ধতি আলম একে একে শিখল। আলমের গানের গলা দিন দিন হয়ে উঠতে লাগল আরো মিষ্টি মধুর। দমও বাড়তে লাগল। গোপালকৃষ্ণ এই গলা সাধার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটাকে শেখাতে লাগলেন মৃদঙ্গ বাজনা।

গোপালকৃষ্ণের কাছে শহরের অনেক গুণীজন আসতেন। তাঁরাও অবাক হয়ে লক্ষ্য করেন এক কোণে বসে এই ছেলেটার একমনে গান শেখার কঠোর সাধনা। সবাই ভালবাসেন এই শান্ত ধীর স্থির ছেলেটাকে। ঐ একভাবেই আলমের দিন কেটে চলে।

এই সময়ে একদিন কোলকাতা শহরে হৈ চৈ পড়ে গেল। সবার মুখেই এক কথা "প্লেগ" "প্লেগ"। ইঁদুর দেখলেই সবাই ভয়ে মরে। কেউ কেউতো ভয়ে কোলকাতা ছেড়ে পালিয়েই যেতে লাগল। অলিতে গলিতে লোক মরতে লাগল।

আলম রোজ ভোর রাত্রে উঠেই যায় নিমতলার ঘাটে গঙ্গাস্নান করতে। সেদিনও গিয়েছিল। শ্মশান ঘাটের পাশ দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ যেন তার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। চারদিকে চিতা জ্বলছে। এখানে ওখানে পড়ে রয়েছে মড়া। কেউ ভয়ে জোরে কথা পর্যন্ত বলছে না। ফিসফাস করছে। কোথায় যেন কি ঘটছে। সবাই যেন পালাতে পারলে বাঁচে। ভয়ে আলমের বুকের মধ্যে যেন হাতুড়ি পিটতে লাগল।

* * * *

॥ তের ॥

আলম সেদিন কোনোমতে গঙ্গায় কয়েকটা ডুব দিয়ে উঠল। উঠতেই শ্মশান ঘাটটার নিস্তব্ধতার মধ্যে কানে এল, কে যেন কাকে বলছে, "কোলকাতায় প্লেগের মহামারি সুরু হল তবে?"

আর একজন কে যেন জবাব দিলে, "ইঁদুর থেকেই প্লেগ। যেখানে দেখবে ইঁদুর মরেছে বুঝবে পাড়াটা উজাড় হয়ে গেল বলে। এ এগার শ সাতানুব্বুই সাল। তারিখটা মনে রেখো।"

আলম এসব কথার কিছু বুঝল, কিছু বুঝল না। শ্মশানঘাটের ঐ জ্বলন্ত চিতা, এখানে ওখানে ছড়িয়ে থাকা মরা মানুষ আর চারদিকে লোকজনের এইসব ভয়ের কথাবার্ত্তা শুনে আলমের মনটা ভয়ে অস্বস্তিতে ভরে গেল। ছেলেটা জোরে পা চালিয়ে দিয়ে চলল গুরুর কাছে।

তখনো ভোরের আলো পরিস্কার হয়ে ফোটেনি। এই সাত সকালেই আলম রোজ যায় রাজা সৌরীন্দ্রমোহনের বাড়ি, গুরুর কাছে। এই সকাল থেকে দিন তুপুর পর্যন্ত চলে আলমের সঙ্গীত-শিক্ষা, তারপরে তুপুরে খাবার জন্যে কয়েক ঘণ্টার ছুটি, তারপরে বিকেল থেকে আবার সেই রাত্তির পর্যন্ত।

কিন্তু আজ ছেলেটা রাজা সৌরীন্দ্রমোহনের বাড়িতে ঢুকেই বুঝতে পারল, কোথায় যেন কি ঘটেছে। কেউ কোনো কথা কইছে না। সব চুপচাপ। চারদিক নীরব, নিস্তব্ধ। আলমের গাটা কেমন যেন ছমছম করে উঠল। রোজকার মত আজো সে পায়ে পায়ে গিয়ে ঢুকল গুরু গোপালকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের ঘরে। কিন্তু কেউ কোথাও নেই। এখানেও নীরবতা। শুধু বাদ্যযন্ত্রগুলো এখানে ওখানে রয়েছে

ছড়িয়ে। অনেকক্ষণ ঐভাবে কাটবার পর রাজবাড়ীর যে লোকটা গোপালকৃষ্ণের ঘর ঝাড়পাট করতো তার মুখে আলম শুনলে, গোপালকৃষ্ণ ভট্টাচার্য কাল রাত্তিরেই প্লেগে গত হয়েছেন।

কথাটা শুনে আলম কিছুক্ষণ যেভাবে দাঁড়িয়ে ছিল সেইভাবেই দাঁড়িয়ে রইল। এখন তার কি করা কর্ত্তব্য তা যেন কিছুতেই ভেবে উঠতে পারছে না। গোপালকৃষ্ণ নেই! যে লোক কালও এখানে বসে গান করেছেন----আলমকে ডেকে পাশে বসিয়েছেন। আজ সে নেই! গুরুদেব নেই। মরে গেছেন। আলম কতক্ষণ যে ওখানে দাঁড়িয়ে ছিল খেয়াল নেই। হঠাৎ তার কানে এল কে যেন বিরক্ত হয়ে বলছে, "যা যা, এখন যা। ঘর ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করতে হবে।"

আলম ধীরে ধীরে রাজা সৌরীন্দ্রমোহনের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। এই আলম শেষ বারের মত বেরিয়ে এল ও বাড়ি থেকে, আর কখনো ঢোকেনি ঐ রাজ বাড়িতে।

আলম পথ থেকে একদিন এসেছিল এই রাজ বাড়িতে, আবার এসে দাঁড়াল পথে। পথে দাঁড়িয়ে মনে হল চারদিক শূন্য। কোথায় যাবে? কি করবে? কেউ নেই সহায়। গুরুর কাছে এক মনে এক ধ্যানে কি করে যে সময় কেটে গেছে আলম তা বুঝতেও পারেনি। এক দুই করে কোথা দিয়ে যে কেটে গেছে সাত সাতটি বছর। সুরের সন্ধান পেয়ে ও ভুলেছিল সব দুঃখ ভুলে গেছে নিজের গাঁ শিবপুরের কথা—ভুলে গেছে মা, মধুমালতী দিদির কথা। কোন দুঃখকেই দুঃখ বলে মনে হয়নি।

পথে দাঁড়িয়ে সাত বছর পরে হঠাৎ ছেলেটার মনে হল, তার কেউ নেই, কিছু নেই। হঠাৎ বুকের মধ্যে যেন মোচড় দিয়ে উঠল। বুক ঠেলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না উঠতে লাগল। দুচোখ বেয়ে অঝোরে জল পড়তে লাগল নিঃশব্দে।

সাত বছর আগে যেমনি ছিল আবার তেমনি হল আলমের গতি। থাকে ডাক্তারবাবুর চিলে কোঠায় একবেলা খায় শহরের আতুর ভিখারীদের সঙ্গে, আর একবেলা খায় গঙ্গার জল আর বাকি সময়টুকু কাটায় পথে পথে এদিক ওদিক ঘুরে ঘুরে। আবার নতুন করে শুরু হয় সুরের সন্ধান খোঁজা।

এবার আলম আগের মত তেমন ছোট্টটিও নয়, তাছাড়া এখন কোলকাতার অনেক পথঘাটও তার চেনা। এবার ঘুরতে ঘুরতে একদিন সন্ধ্যায় আলম বিডন ষ্ট্রীট ছাড়িয়ে হেঁদোর কাছে শিমলের দত্তদের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল।

॥ চৌদ্দ ॥

শিমলের এই দত্ত বাড়ির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রামমোহন দত্ত কি বিরাট বাড়িখানা! আলম এই দত্ত বাড়িব শিক্ষায় দীক্ষায় গানে বাজনায় নামকরা ছেলেদের কথা লোকমুখে শুনেই এখানে এসে হাজির হয়েছে। যদি আবার কোনো নতুন সুরের হদিশ পায় এই আশায়।

শিমলের অনেকটা জায়গা জুড়ে তৈরি এই দত্ত বাড়ি। যেন একাই একটা পাড়া। এ-মাথা থেকে ও মাথা দেখা যায় না। এমনি মস্ত।

রামমোহন দত্তের পর এ বাড়িতে পার হয়ে গেছে আরো দুই পুরুষ। নাতিরা বাড়ি ভাগ করে নিয়েছেন নিজের নিজের অংশ। আলম যখন ও-বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল তখন ও-বাড়িতে বাস করছিলেন রামমোহন দত্তের নাতি-পুতিরা।

তখনকার দিনে বাংলা দেশে শিক্ষায় দীক্ষায় জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ির রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরদের যেমন নামডাক ছিল, তেমনি ছিল দত্ত বাড়ির এই ছেলেদের নাম। কিন্তু এ বাড়ির ছেলেরা তখনকার দিনে বাংলার ধনী শিক্ষিত লোকদের মত হিন্দুধর্ম্ম ছেড়ে খৃষ্টান অথবা ব্রাহ্ম হয়ে যান নি। আবার গোঁড়া হিন্দুদের মত এ কথাও মানতেন না যে সমুদ্র যাত্রা করলে, কি বিধবা বিয়ে দিলে কিম্বা নতুন কিছু একটা করলেই হিন্দুত্ব নষ্ট হবে, জাত যাবে।

এই দত্ত বাড়িতে তখন পঁচিশ ত্রিশজন ছেলে মেয়ে। সবাই নানা শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠেছেন। দেশ, সমাজ, ধর্ম্ম নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন। কেউবা শরীর চর্চা, কেউবা গানবাজনা নিয়ে মেতে রয়েছেন। এই দত্ত বাড়ির ছেলেই স্বামী বিবেকানন্দ।

আলম এহেন এই দত্ত বাড়ির সামনে একটুক্ষণ দাঁড়িয়েই বুঝলে এখানে ঐ রাজা সৌরীন্দ্রমোহনের বাড়ির মত দারোয়ান, পেয়াদা, চাকরবাকরের অত কড়াকড়ি নেই। অহেতুক জিনিসপত্রের জাঁক জমকও কম। লোকজনে যেন বাড়িটা গম গম করছে। কেউ শরীর চর্চ্চা করে ফিরছে, কারো হাতে বই পুস্তক, কেউ বা ঢুকছে বাদ্যযন্ত্র নিয়ে। রাজার বাড়িতে সবাই থাকত যেন ভয়ে ভয়ে, চুপচাপ। কিন্তু এখানে যেন তেমন নয়।

বিবেকানন্দের খুড়তুতো বড় ভাই অমৃতলাল দত্ত। দেখতে শুনতে কিন্তু একেবারে অন্যরকম। খ্যাংড়া কাঠির ওপর যেন আলু গাঁথা এমনি রোগা। তেমনি উড়ন চণ্ডী। কর্ত্তারা মারা গেছেন। অমৃতলাল নিজেই দত্ত বাড়ির এক অংশের মালিক।

সকাল সন্ধ্যা গান বাজনার হাল্কা হাওয়ায় মাতিয়ে রাখতেন এই দত্ত বাড়িকে। তখনকার দিনে বিদেশী ইওরোপীয় বাদ্যযন্ত্রের সেরা বাজিয়ে ছিলেন তিনি। ক্ল্যারিওনেট বাজনায় সারা ভারতে

তাঁর জুড়ি ছিল না বললেই চলে। রামপুরের নবাব খবর পেয়ে তাকে একবার নিয়ে রেখেছিলেন তাঁর দরবারে। দরবারের ওস্তাদ উজির খাঁর সঙ্গে। সসম্মানে। সবাই তাকে চিনত "হাবু দত্ত" বলে। তাঁর ছোট ভাই সুরেন্দ্রনাথ দত্ত, লোকে বলত "টুমু দত্ত" হাবু দত্ত, টুমু দত্ত এই দুই ভাই-ই ছিলেন গান বাজনার সমান পাগল।

আলম লোকমুখে ঐ হাবু দত্তের নাম শুনে এসেই ঘুর ঘুর করছে এই দত্ত বাড়ির সামনে। সন্ধ্যা হতেই ফুর্ত্তিবাজ সৌখীন বাবুর দল একে একে জুড়ি গাড়ি হাঁকিয়ে এসে জড়ো হচ্ছেন হাবু দত্তের বৈঠকখানায় দত্ত-বাড়ির প্রধান গেট দিয়ে ঢুকেই ডান হাতে তার ঘর। আলমও গিয়ে দাঁড়াল বাড়ির দোরগোড়ায়, ভেতরে চলেছে বাজনা। অদ্ভুত অদ্ভুত সব বিদেশী বাজনা বাজছে, এক সঙ্গে অনেকে মিলে বাজাচ্ছেন। আলম মুগ্ধ হয়ে গেল তাঁদের বাজনা শুনে। মনে মনে ঠিক করে ফেলল এই হাবু দত্তের কাছেই সে বাজনা শিখবে। তাঁর শিষ্যদলে ভর্ত্তি হবে।

বাজনা শেষ হলে আলম একেবারে সোজা হাবু দত্তের পা ধরে পড়ল, "আমি আপনার পায়ের তলে পইড়া থাকমু।"

* * *

।। পনের ।।

হাবু দত্তের আসরে যে সব বন্ধু-ইয়ার আসতেন তারা প্রায় সবাই নেশা-টেশা করতেন। সবাই ছিলেন সৌখিন, ফুর্তিবাজ। হাবু দত্তও ছিলেন দিল-দরিয়া খেয়ালী মানুষ। আলমের মুখের দিকে চেয়ে একটু চুপ থেকে বললেন, "তোর নাম?"

আলম বলল, "আলাউদ্দিন খাঁ। আমার মাথাটা বড় কিনা তাই—"

আলমের কথার টান শুনে ভুরু কুঁচকে কিছুটা অনুমান করে হাবু দত্ত শুধালেন, "তোর বাড়ি কোথায়? পদ্মার ওপারে?"

আলম মাথা নেড়ে জানাল,

"আজ্ঞে হাঁ।" একে একে ত্রিপুরার শিবপুর গ্রাম থেকে গান বাজনা শোনার বাসনা নিয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে আসার কাহিনী বলল। এখানের দিনগুলিই বা কি করে কাটছে ওর, তাও বলল।

হাবু দত্তের আসরের সবাই ছেলেটাকে ঘিরে ধিরে ওর কাহিনী শুনলেন। হাবু দত্ত ওর কাহিনী শুনে বললেন, "এখন থাকছিস ফুটপাতে আর খাচ্ছিস ভিকীরীদের সঙ্গে ঐ লঙ্গরখানায়? তুই শিখতে চাস গান বাজনা?"

ছেলেটা মাথা নিচু করে চুপ করে রইল। মনে মনে ভাবলো আসল পরিচয় পেয়ে এবার দারোয়ান ডেকে হাবু দত্ত বুঝি ওকে দেবেই বাড়ি থেকে বার করে। কিন্তু হাবু দত্ত খুশিভরা কণ্ঠে ছেলেটার পিঠে চাপড় দিয়ে বলে উঠলেন, "সাবাস বেটা! তুই বাড়ি ঘরের সব মায়া যখন কাটিয়ে এসেছিস—ঠিক আছে, আমি তোকে শেখাব। সংসারি লোকের জন্যে এ পথ নয়। তুই রোজ আসবি আমার কাছে।"

হাবু দত্তের বাবা আগেই গেছেন মারা। হাবু দত্ত ঠাকুমার আদরে মানুষ। সংসারের ধারও ধরাতেন না। লেখা-পড়ার দিকেও তেমন ঝোঁক ছিলনা। ওদিকে জ্যাঠতুতো ভাই নরেন্দ্রনাথ দত্তরা বাপের কড়া শাসনে টক টক করে উচ্চ শিক্ষিত হয়ে উঠতে লাগলেন। ওদিকে হাবু দত্ত বাপের সম্পত্তি বেচে কিনে উড়িয়ে দিতেন আর গান বাজনা করে বেড়াতেন।

আলমেরও সংসারে কোনো ভাবনা চিন্তা নেই। রাস্তাই তার সম্বল। হাবু দত্ত আর আলমেতে বন্‌ল খুব। গান বাজনা ছাড়া এরা সংসারবাসের আর কিছুই জানে না।

হাবু দত্ত তাঁর শিষ্যদের দিকে চেয়ে বললেন, "এই পরাধীন গরীব দেশে যারা নিজের সংসার বাঁচাতে চাও তারা আমার কাছে গান বাজনা শিখতে এসোনা। এদিকে এলে তোমাদের সংসার চুলোয় যাবে। দুটো একসঙ্গে হয় না! দেশ স্বাধীন হলে অন্য কথা। তখন দেশের সরকারই দেখবে সব। আমরা পরাধীন জাত, মনে থাকে যেন, আমাদের ইচ্ছায় এ দেশ চলে না।"

শিমুলের এই দত্ত বাড়িতেই আলম প্রথম শুনলে দেশের কথা। "আমরা পরাধীন জাত"—আমাদের ইচ্ছায় দেশ চলে না—" এ সব কথা আলম যে ঠিক ঠিক বুঝলে তা নয়, তবু যেন ওর মন কথাগুলিতে সায় দিয়ে উঠল "ঠিক ঠিক"।

আলম তো নিজের জীবন দিয়েই এ-কথাগুলি বুঝেছে আরো সহজভাবে। কত রাত্তিরে মা মধুমালতী দিদি, নিজের গাঁয়ের কথা মনে পড়ায় আপন মনেই কেঁদে কেঁদে ভাসিয়েছে। তবু দেশে ফিরে যেতে সাহস হয়নি। ভয় হয়েছে মা যদি ফের গান বাজনা ছাড়িয়ে গৃহস্থ ঘরের সংসারের কাজে লাগিয়ে দেয়!

হাবু দত্ত আলমকে শুধালেন, "কি শিখবি, গান?"

আলম বলল, "আজ্ঞে না, যন্ত্র শিখব।"

আলমের মন তখন মজে রয়েছে, একটু আগেই মুগ্ধ হয়ে শোনা ক্ল্যারিওনেট, পিক্‌লু, বেহালা ঐসব বিদেশী বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে। তাই ঠিক হল। হাবু দত্ত ওকে বাজনাই শেখাবেন ঠিক করলেন।

আলম সকাল সন্ধ্যা রোজ আসে শিমূলের এই দত্তদের বাড়ি। হাবু দত্তের আর আর শিষ্যরাও আসেন। সেখানে হরেক রকমের বিদেশী বাদ্যযন্ত্র বাজান হয়।

দেশী হোক আর বিদেশী হোক—'নুলো গোপালে'র কাছে সাত বছর স্বরসাধনা করে আর গান বাজনা সম্পর্কে ঐ দারুণ আগ্রহ থাকার ফলে আলমের কান এমন তৈরী হয়েছিল যে একবার যা শোনে তাই তার মনের মধ্যে গেঁথে যায়। মুহূর্ত্তের মধ্যে সে সুর সে নির্ভুল ভাবে গেয়ে শুনিয়ে দিতে পারে। মুখে মুখে সে স্বরলিপি করে দিতে পারে। দু'একবার দেখেই যে কোনো যন্ত্রে তা পট পট করে বাজিয়ে দিতে পারে। যে বাজনা শিখতে অন্যদের এক বছর লেগে যায়, আলমের তা এক মাসও লাগে না।

আলমের মায়ের বড় ভয় ছিল আলম বড় হলে ওদের পূর্ব্বপুরুষ সন্ন্যেসী ডাকাতদের মত বুঝি ডাকাত হয়ে যায়; সুরের রাজ্যেও আলম বুঝি ডাকাতই হল। যা শোনে তাই সে মুহূর্ত্তে লুটে পুটে শিখে নেয়।

হাবু দত্তের আখড়ার বাঁশী, ক্ল্যারিওনেট, পিক্‌লু, সেতার, ম্যাণ্ডোলিন, ব্যাঞ্জো দেশী বিদেশী যা যা বাজনা হত, আলম একে একে সব শিখে ফেললে। গৎও শিখলে বিস্তর। হাবু দত্তের বহু ইমন রাগের গৎ জানা ছিল। আলম তাঁর খাতা থেকে এক একদিন চারটা-পাঁচটা করে গৎ ঐ সব বাদ্য যন্ত্রে শিখে তুলে নিলে। ওর যেন কিছুতেই ক্লান্তি নেই।

হাবু দত্ত ইওরোপীয় বাদ্যযন্ত্র দিয়ে বিদেশী কায়দায় তৈরি করতেন দেশী সুরের বাজনা। আমাদের দেশী বাজনায় এক সঙ্গে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র বাজবার চলন নেই, হাবু দত্ত তাই চালু করলেন। এর থেকেই আমাদের দেশে থিয়েটার যাত্রায় চালু হল দেশী সুরে বিদেশী "কর্ণসার্ট' বাজনা। তখনকার দিনে নাম করা থিয়েটার "ন্যাশানাল থিয়েটারে"র বাজনা হাবু দত্তই তৈরি করে দিতেন।

বিভিন্ন থিয়েটারের অনেক গানের সুরও তাঁর দেওয়া। থিয়েটার মহলে হাবু দত্তের ছিল খুবই খাতির।

॥ ষোল ॥

সেদিন বিকেলে তখনও আর আর শিষ্যরা দত্তবাড়ি এসে জড়ো হয়নি তখন শুধু ছিল আলম। হাবু দত্ত কি যেন ভেবে খোশ মেজাজে ছেলেটাকে বললেন, "চল তোকে একটা থিয়েটারে কাজ করিয়ে দিই। একটাকা করে মাইনে পাবি। তোকে বাজাতে হবে তবলা। চল্।"

আলম থিয়েটারে তবলা বাজবার কথায় রাজি হয়ে গেল। তবলা শিক্ষা আলমের নতুন নয়। "নুলো গোপালে"র কাছে থাকতেই সে তবলা বাজিয়ে হাত পাকিয়েছে। নুলো গোপালের গানের সঙ্গে মৃদঙ্গ অথবা তবলা যখন যা দরকার হত তা বাজাতেন নন্দ ভট্টাচার্য্য। আলম তাঁর কাছ থেকে মৃদঙ্গ আর তবলা দুই-ই বাজাতে শিখেছিল।

হাবু দত্তের সঙ্গে বাড়ি থেকে বেরিয়ে বিডন ষ্ট্রীট ধরে পশ্চিমমুখো যেতে যেতে ছেলেটা মনে মনে খুশি হয়ে উঠল এই ভেবে যে, গান

বাজনার আর একটা নতুন জগৎ হয়ত সে দেখতে পাবে থিয়েটারেতে, এক্ষুণি।

বিডন ষ্ট্রীট ধরে ওরা এসে ঢুকল মিনার্ভা থিয়েটারে। তখন মিনার্ভা থিয়েটারে তব্‌লা বাজাতো সেকেলে এক বুড়ো, নাম শশী সাহা। তামাকের ধোঁয়ায় লালচে এক জোড়া গোঁফ ঝুলছে মুখের ওপর। গুলি খেয়ে সব সময়ই নেশায় বুঁদ হয়ে আছে। তবলা বাজাবার সময় হলে আর একজনের আবার পেছন থেকে খোঁচা মেরে তাকে জাগিয়ে দিতে হত, আর অমনি সে ধাঁই ধপাধপ তব্‌লা পিটতে শুরু করে দিত। এই উৎপাতে থিয়েটারের সমস্ত বাজনাটাই হ'ত মাটি।

তখন মিনার্ভা থিয়েটারের প্রাণ হচ্ছেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ। আগে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে এখানে ওখানে বড়লোকদের বাড়িতে পাল-পার্ব্বণে ট্‌কটাক করে ছাড়া-ভাঙা ভাবে থিয়েটার হত। সাধারণ মানুষের সে সব থিয়েটার দেখার সুযোগ কমই হ'ত। থিয়েটার তখনও তেমন ভাবে সাধারণের মধ্যে চালু হয়নি। অনেকে আবার থিয়েটারকে ভাল চোখেও দেখতেন না।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ সাধারণ মানুষের জন্যে সাধারণ হলে দিনের পর দিন থিয়েটার করতে লাগলেন। তার জন্যে তাঁকে দুঃখও ভোগ করতে হয়েছে বহু, নিন্দাও সয়েছে অনেক। তিনি নিজেই নাটক লেখেন, নিজেই দল গড়েন, পরিচালনা করেন, নিজেই বিশেষ বিশেষ ভূমিকায় অভিনয় করেন। ক্রমে বাংলাদেশে থিয়েটার দেখার একটা হিড়িক্ পড়ে গেল তাঁর যুগে।

গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে হাবু দত্তের ছিল খুবই খাতির। গিরিশচন্দ্রের বহু নাটকে এই হাবু দত্ত সুর দিয়েছেন। তাই তিনি তবলচি গুলিখোর শশী সাহার কথা জানতেন। থিয়েটারে নতুন তবলচি রাখার কথা উঠলে হাবু দত্ত নিয়ে এলেন এই নিরীহ ভাল ছেলেটিকে।

এইটুকু বয়সে ছেলেটার অমন পরিষ্কার নির্ভুল তব্‌লা বাজনা শুনে গিরিশচন্দ্র মুগ্ধ হয়ে গেলেন। ওর কাজ হল। কিন্তু দু' একজনের মধ্যে কথা উঠল ওর জাত নিয়ে। তখন থিয়েটারে যারা কাজ করতেন সবাই হিন্দু এক ঐ আলম ছাড়া।

একদিন গিরিশচন্দ্র অভিনয় সেরে হঠাৎ আলমকে সামনে পেয়ে অভিনয়ের ঝোকেই যেন বললেন "তোর নাম আলাউদ্দিন খাঁ? না না, এ সব মুসলমান-টুসলমান এখানে চলবে না। আজ থেকে তোর নাম হল প্রসন্ন বিশ্বাস। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক তাই, পেসন্না বিশ্বাস।"

সেই থেকে থিয়েটারেও আলমের নাম হল 'প্রসন্ন বিশ্বাস।' ওখানে সবাই ডাকল প্রসন্ন বিশ্বাস বলে। ধীরে ধীরে ওর 'আলাউদ্দিন নাম গেল মুছে।

থিয়েটারে যে সব মেয়েরা অভিনয় করে, নাচে গান গায় তাঁরা সবচেয়ে ভালবাসে এই নিরীহ ভাল ছেলেটাকে। সবাই আলমকে ডাকতে লাগল 'বিশ্বাসদা বলে।

থিয়েটারে কে কাকে বিশ্বাস করে? একটা জিনিস একটু হাত ছাড়া করে রাখবার জো নেই। কে কোনদিক দিয়ে টুক্ করে নিয়ে সরে পড়বে। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই এই বিশ্বাসদাকে সবাই বিশ্বাস করতে লাগল।

আলম পর্দ্দার পেছনে এক ধারে তবলা নিয়ে চুপ করে বসে থাকে। মেয়েরা নাচতে যাবে কি পার্ট বলতে যাবে তখন তাদের দামি গয়না বা টাকা-পয়সা যা সঙ্গে থাকত তা হামেশাই আলমের হাটুর নিচে গুঁজে রেখে যেত। আর নাচ বা পার্ট সেরে এসে সেখান থেকে যেমনি ছিল ঠিক তেমনি অবস্থাতেই নিয়ে যেত।

একটা কিছু একটু এদিক ওদিক হত না। এক একদিন আলমের তুই হাঁটুর নিচে সোনার গয়না, টাকা পয়সা, দামি রুমালে ভরে যেত। কোনো কিছুরই একটু নড়চড় হত না। তাই মেয়েরা আলমকে আদর করে ডাকত বিশ্বাসদা।

থিয়েটারে নানা রকমের হৈ হট্টগোল হাসি তামাসা হয় কিন্তু আলম থাকে চুপচাপ, মাথা নিচু করে। তার বাজাবার সময় এলে বাজায়। এই।

একদিন থিয়েটার শেষে এমনি হাসি-ঠাট্টা হচ্ছে। মেয়েরা সাজগোজ খুলছে, পোষাক ছাড়ছে। কি কথায় কে একটি মেয়ে বলল, "থাক থাক বিশ্বাসদা থাক, তাতে কোন ক্ষতি নেই।"

তখন গিরিশচন্দ্র যাচ্ছিলেন ওদিক দিয়ে। তিনি থেমে ছেলেটার পিঠে চাপড় দিয়ে বললেন, "মেয়েরা দেখি তোকে খুব ভালবাসে। কিন্তু খবরদার—সব সময় মনে রাখবি তুই আছিস যত সব ওঁচাটে বজ্জাতদের মধ্যে। হাঁসের মত জলে থাকবি কিন্তু তোর গায়ে যেন জল না লাগে। কোনো কু-মতলব করেছিস কি মরেছিস। জীবনের মতো বরবাদ হয়ে যাবি। আর তোর দ্বারা কিছু হবে না"

আলম চুপ করে গিরিশচন্দ্রের মুখের দিকে চেয়ে রইল। গিরিশচন্দ্রের ভরাট থমথমে চৌকোনো মুখ। মুখের-প্রতিটি পেশী দিয়ে যেন উনি কথা বলছেন। এক-এক কথায় এক-এক রকম ভাবে পেশীগুলি যেন ব্যক্ত করেছে কথার ভাব। যে শব্দে যেমন জোর দেওয়া উচিত গলার স্বর ঠিক তেমনি ভাবেই উঠেছে নামছে। গিরিশচন্দ্রের কথাগুলি যেন আলমের মনের মধ্যে একে একে গেল গেঁথে। এযেন আর জীবনে ভোলবার নয়।

* * *

॥ সতের ॥

দিনতো আর কারোর জন্যে বসে থাকে না। ত্রিপুরা জেলার শিবপুর গ্রামের দিনও একে একে যায় পার হয়ে। শোকে দুঃখে আলমের সংসারের দিনও গড়িয়ে চলে।

আলমের মা সারাদিন থাকেন সংসারের নানা ঝামেলা নিয়ে। সংসারের সব দিক তাকেই দেখতে হয়। শীত নেই, গ্রীষ্ম নেই সারাদিন কাটে গৃহস্থ সংসারের নানা কাজে।

হয়ত সাত সকালে উঠে উঠোন ঝাঁট দিচ্ছেন, চারিদিকে কারো সাড়া শব্দ নেই, শুধু ভোরের পাখি ডাকছে কিচির মিচির করে। অদূরে হয়ত শস্য ক্ষেতের বেড়ার ওপর বসে মোরগ ডেকে উঠল। হঠাৎ হয়ত তিনি স্তব্ধ হয়ে কান পেতে দাঁড়ালেন। কোনো কচি পায়ের হাল্‌কা শব্দ পাওয়া গেল কি? কেউ আসছে বুঝি? আলম?

মা-র বুকের ভেতর কাঁপতে থাকে। ভয়ে ভয়ে সদরের দিকে মুখ ঘুরিয়ে দেখে হতাশায় ভেঙে পড়েন। কেউ কোথাও নেই। হয়ত হালকা হাওয়া উড়িয়ে দিয়ে গেছে শুক্‌নো ঝরা কুলের পাতা।

আলমের মার দম নেবার সময় নেই। তখনো হয়তো উঠোন নিকানো বাকি। পাড়া-পড়শীরা ওঁর দিকে চেয়ে বলেন, "শক্ত মেয়ে মানুষ।"

আলমের বাবা আগের মতই আছেন। কারো সাতেও নেই পাঁচেও নেই। সংসারের কোনো কাজে তাকে পাওয়া যাবে না। পারলে তিনি সংসারের সবকিছু পরকে বিলিয়ে দেন। যেন একেবারে সাধু। সাধে কি আর গাঁয়ে লোক 'সাধু খাঁ' বলে ডাকে।

তিনি ত্রিপুরার রাজদরবারে ওস্তাদ কাশেম আলি খাঁর কাছ থেকে সেতার শিখেছিলেন —দিন-রাত সেতার বাজনা নিয়েই আছেন।

আলমের মা যে জিনিসটা চায়নি তাঁর ছেলেরা যেন সবকটা সেই পথেই গেল। সবাই যেন বাপের প্রকৃতি পেল। আলমের দাদা আফতাফউদ্দিন যেন বাপকেও ছাড়িয়ে গেল। ফকিরের মত তাঁর বেসবাস। দিনরাত আছে প্রার্থনা আর বাদ্যযন্ত্র নিয়ে। এখন থেকেই গাঁয়ের লোকে ওকে ডাকতে শুরু করেছে আফতাব-উদ্দিন ফকির সাহেব বলে। কে কাকে বোঝাবে।

মধুমালতী দিদির শ্বশুর ঘর থেকে মাঝে মাঝে আসেন। তাঁর সামনে তাঁর ঐ নিরীহ ক্ষুদে ভাইটির কথা উঠলেই চোখ দিয়ে টপটপ করে জল গড়িয়ে পড়ে। কেঁদেকেটে যাই হোক মনের দুঃখ হাল্কা করে যায়। কিন্তু মধুমালতী দিদির দুঃখ আর বাঁধ মানে না যখন দেখে চোখের সামনেই এই গাঁয়েরই বসির চাচার মেয়ে মদিনাবিবি একটু একটু করে বড় হয়ে উঠছে। এক দুই করে সাত আট বছরের ডাগরটি হয়ে উঠেছে। আর কদিন পরেই হয়ত ওঁর বিয়ের কথা উঠবে। হায় হায় আলম নেই।

মদিনার বাবা আর আলমের বাবা হলেন পরম বন্ধু। বসির মহম্মদ দেখতে যেমন সুপুরুষ তেমনি চমৎকার বাঁশি বাজান। তাতেই দু'বাড়ীতে অত খাতির। আলম যখন এইটুকু, মায়ের কোলে তখনই একদিন সাধু খাঁ বলেছিলেন বন্ধুকে এর পরে তোমার যদি মেয়ে হয় তবে এই ছেলের সঙ্গে তোমার মেয়ের বিয়ে দেবো। রাজি? বন্ধুও এক কথাতেই রাজী হয়েছিলেন। কয়েক বছর পর বন্ধুর মেয়ে হল, বাবা নাম দিলেন মদিনাবিবি। ভাবী শ্বশুর আদর করে ডাকলেন মদনমঞ্জুরী। সেই মেয়ে এখন সাত আট বছরের ডাগরটি। মধুমালতী দিদি মদনমঞ্জুরীকে দেখে আর ভাই-এর কথা ভেবে চোখের জলে ভাসে।

একদিন দুপুরে ঘরের বৌঝিরা সংসারের কাজ সেরে খেয়ে দেয়ে দাওয়ায় বসে রোদে পিঠ দিয়ে পান চিবুতে চিবুতে গল্প গাছা করছিল। তখন—

মুখে মুখে কথাটা ছড়িয়ে গেল। খবর শুনে ও গাঁ থেকে মধুমালতী দিদি এলেন ছুটে। সে দিন এ পাড়াতে সবাই শুনলে, গাঁয়ের পণ্ডিত মশাই-এর বড় ছেলে কোলকাতার কোন নোঙরা জায়গায় আলমকে নাকি স্বচক্ষে দেখে এসেছে।

আলম যে আশা নিয়ে থিয়েটারে কাজ নিয়েছিল তার কোন কিছুই হলনা। ভেবেছিল এখানে এসে কত নতুন কিছু দেখবে, নতুন কিছু শিখবে। কিন্তু কদিন যেতেই ওর কাছে মনে হতে লাগল সবকিছু যেন কেমন এক ঘেয়ে।

যেমনি নাচ তেমনি গান। তখন মিনার্ভা থিয়েটারে নাচ শেখান নৃপেন বসু। নাচ দেখে আলমের মনে হয় মেয়েগুলি যেন ধুপধাপ করে হাত পা ছুঁড়ে কিছুক্ষণ লাফিয়ে যায়। গানও হয় তেমনি। "বাজে কাজে মিন্‌সেকে আর যেতে দেব না।" নয়ত "লেও সাকী দাও ভর প্যালা"—এমনি সব বাজে এক ঘেয়ে গান।

কিন্তু থিয়েটারের সবাই ভাবে তারা কত জানে শোনে, কত গুণী। আলম তার মধ্যে চুপ করে থাকে। এই এক ঘেয়েমি থিয়েটারের গান বাজনার মধ্যে যেন হাঁপিয়ে ওঠে। ওদিকে হাবু দত্তের কাছে যা শেখার তাও প্রায় শেষ হয়ে এল। আলমের মনটা আবার আঁকু-পাকু করতে থাকে নতুন কিছু শেখার জন্যে।

সেদিন ওর থিয়েটারের কাজ ছিল বন্ধ। সারা বিকালটা গঙ্গার ধার দিয়ে একা একা বেড়াচ্ছিল ঘুরে। ঘুরতে ঘুরতে এসে দাঁড়াল ফোর্ট উইলিয়াম দূর্গের কাছে। তখন সন্ধ্যা হয় হয়। দুর্গের ব্যাণ্ড বেজে উঠল দূর্গের সামনে। আলমের আর যাওয়া হল না, চুপ করে

দাঁড়িয়ে শুনতে লাগল সেই বাজনা। কিছুক্ষণ পরে মনে মনে বলে উঠল, "আঃ এই বাজনাই যদি না শিখতে পারলাম তবে কিসের বাজনা শেখা।"

ব্যাণ্ড বাজনা শেষ হতেই আলম অমনি ব্যাণ্ড মাষ্টার লবো সাহেবের পিছু নিল। লোকটা যায় কোথায়? চোখে চোখে রেখে আলমও এগুতে লাগল পিছু পিছু, লোব সাহেব সাইকেল চলে, আলম দৌড়ায়।

।। আঠারো ।।

আলম আর আগের মতটি নেই। এখন কোলকাতা তার অচেনা নয়। ব্যাণ্ডমাষ্টার লবো সাহেবের পেছন পেছন এসে ঠিক খুঁজে বের করলে তাঁর বাসা। ময়দান থেকে বেরিয়ে ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট ধরে কিছু দূরে এসেই ডান হাতে।

বাড়িতো চেনা হল। কিন্তু একে অত বড় বেহালা বাজিয়ে তায় আব্লুর গোয়ানীজ সাহেব লোক, সাহস হয় না তাঁর কাছে ঘেঁষতে সামনা সামনি তাঁকে কিছু বলতে।

আলম তখন থেকে সন্ধ্যায় ছুটি পেলেই চলে যায় ময়দানে, ফোর্ট উইলিয়ামের কাছে দাঁড়িয়ে ওঁদের ব্যাণ্ডের বাজনা শোনে। কখনো বা ঘোরে লবো সাহেবের বাড়ির ধারে কাছে। আলম লবো সাহেবের বেহালা শোনে আর ভাবে, আঃ! এই ইংরেজি বাজনা না শিখলে জীবন বৃথা!

আলমের খোঁজার যেন আর শেষ নেই। গোপাল কৃষ্ণের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সব কিছু যেন কেমন হয়ে গেল। কিছুতেই যেন আর স্থিতি নেই। একবার এটা, একবার ওটা। ওর যেন হয়েছে অন্ধকার ঘরে আটকে পড়া লোকের দশা। শুনতে পায় বাইরের ডাক, কিন্তু বেরুবার পথ পায় না। দেয়ালে মাথা খোঁড়ে। ও কোথায়? কোথায় সে সুর।

ইতিমধ্যে একদিন আলম মেছোবাজারের রাস্তা ধরে যেতে শুনল হাজারী ওস্তাদের শানাই বাজনা। মন যেন উদাস করে দেয়। সেই থেকে ওর মাথায় ঢুকল, ব্যাণ্ড আর শানাই এ ছটোই তাকে শিখতে হবে।

আলম সকলকেই সম্মান করে কথা বলে। ওর নিরীহ নরম ভাব দেখলে সবাই খুশি হয়, ওর কথা বিশ্বাস করে। তাই একদিন যখন হাজারী ওস্তাদের কাছে গিয়ে বললে, "ওস্তাদজী আমি আপনার পায়ের নখের যুগ্যি। আমাকে দয়া করে একটু শানাই-এর তালিম দিন।"

তখনকার দিনে আজকের মত টাকা দিয়ে গান বাজনা শেখার মাষ্টার মিলত না। ওস্তাদরা খুশি হলে তবেই ছাত্রদের শেখাতেন। হাজারী ওস্তাদ ছেলেটার ব্যবহারে বড় খুশি হলেন, বললেন, "জিতা রহ ব্যাটা"।

আলম হাজারী ওস্তাদের কাছে শানাই, নাকড়া, টিকাড়া বাজাতে শিখতে লাগল। কিন্তু সাহেবের কাছে বেহালা শেখা বুঝি তার ভাগ্যে হয় না। সময় পেলেই লবো সাহেবের বাড়ির আশে পাশে ঘুর ঘুর করে লুকিয়ে লুকিয়ে বেহালা শোনে। এমনি করে দিন যায়। সাহস হয় না, সাহেবের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়।

একদিন সাহেব বাড়ি থেকে বেরুতে যাচ্ছে আলম সাহসে ভর দিয়ে একেবারে দোরের সামনে গিয়ে পড়ল, "সাহেব আমাকে বেহালা শেখাবে ?"

সাহেব প্রথমটা বুঝলে না। কিন্তু যখন বুঝলে তখন একেবারে ক্ষেপে লাল। বলল, "বেরো, যা, গেট আউট সাহস তো কম নয়। ব্লাডি নিগার!"

আলম ভয়ে পিছিয়ে এল। সাহেব কি-সব গালি বিড় বিড় করতে করতে গটমট করে বেরিয়ে গেল।

ভয়ে দুঃখে অপমানে আলমের মনে হল সে যেন মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ সে স্থির হয়ে রইল। নড়তে পারলে না জায়গা ছেড়ে। কি করবে ? তার বেহালা শেখা হবে না ভাবতেও চোখ ফেটে জল এসে যায়। যে উগ্রচণ্ডী সাহেব! এখানে কোনো আশাই নেই। চলে যাবে ভাবছে এমন সময় মেয়েলি মিষ্টি গলা পেছনে শুনতে পেল। কে যেন ডাকছে, "এই খোকা।"

আলম পেছন ফিরে দেখলে গোরা মেম সাহেব, আবার বললেন, "কোনো ডর নেই আছে। কি চাচ্ছো ?"

আলম ভয়ে ভয়ে আস্তে আস্তে বললে তার মনের কথা। মেম শুধালেন, "তুমি সাহেবের নিকট বেহালা শিখটে চাও ?"

আলম মাথা নাড়লে। ওর মুখের দিকে চেয়ে মেম সাহেবের বুঝি দয়া হল, একটু ভেবে বললেন, "টুম বেহালা জানে ?"

আলম মাথা নেড়ে চুপ করে রইল।

মেম সাহেব আলমকে ওঁদের বৈঠকখানা ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে ওর হাতে একটা বেহালা দিলেন এবং নিজেও একটা নিলেন। মেম সাহেব চমৎকার বেহালা বাজান। তিনি অবাক হয়ে গেলেন আলমের

বাজনা শুনে। তিনি যা দেখিয়ে দেন আলম তাই বাজিয়ে দেয়। একবারের বেশী দুবার দেখাতে হয় না। মেম সাহেব খুশি হয়ে বার বার বলতে লাগলেন ‘ভেরি গুড, ভেরি গুড—টুমি বেহালা জানে।’’

সেই ঠিক হল। সাহেব যখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবে তখন আলম আসবে মেমসাহেবের কাছে। মেম সাহেবকে লুকিয়ে গোপনে তাকে শেখাবেন। তাঁরও সময় কাটবে।

এমনি করে আলমের বেহালা শিক্ষা চলতে লাগল গোপনে। মেমসাহেব ওকে আস্তে আস্তে ইংরেজি স্বরলিপি পড়তে শেখালেন যাতে আলম বই দেখে দেখে নিজে থেকেই বাজাতে পারে।

একদিন মেমসাহেব আর আলম মিলে খুব বাজাচ্ছে। কোন দিকে খেয়াল নেই। দু'জনেই একেবারে ডুবে গেছে বাজনায়। বাজনা শেষ হলে মেমসাহেব খুশি হয়ে কি যেন বলতে গেলেন— এমন সময় আলম অনুভব করল তার কান ধরে কে যেন টানছে। আলম মুখ ঘুরিয়েই দেখে স্বয়ং লবো সাহেব। আলম একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। সাহেব তা হলে এতক্ষণ পেছনেই দাঁড়িয়ে ছিল। সব শুনেছে।

মেমসাহেব খুশি ভরা কণ্ঠে কি যেন বলে উঠল। আলম ভেবে পেল না এখন তার ভাগ্যে কি আছে। কিন্তু সাহেবও খুশির সঙ্গে কি যেন জবাব করলে। মেমসাহেব আলমকে বুঝিয়ে বললে, ‘‘আলা-উদ্দিন তোর বাজনা শুনে সাহেব খুব খুশি হয়েছে। এখন থেকে ওই তোকে শেখাবে।’’

লবো সাহেবের ব্যাণ্ডে আলমও ভর্তি হল। আলম মিনার্ভা থিয়েটারের চাকরি ছাড়েনি। সেখান থেকে মাইনে যা পায় তার একটি আধলাও সে নিজের জন্য খরচ করে না। দিনে খায় একবার। তাও ঐ ভিখারীদের সঙ্গে কিনে পয়সায়।

সেটাই তার অভ্যাস হয়ে গেছে। বাজে নেশাটেশাও নেই। পয়সা যা পায় সবই জমে। মনে মনে স্বপ্ন দেখে নিজে একটা বেহালা কিনবে। তাছাড়া লম্বা সাহেব কর্নেটও চমৎকার বাজায়, তাও একটা কিনতে হবে। শানাইও একটা চাই। কিন্তু বার টাকা তার মাইনে। তবু হাল ছাড়ে না।

সেদিন থিয়েটার শেষ করে মিনার্ভা থেকে আলম বেরুচ্ছে হঠাৎ কে একজন লোক এসে দাঁড়ালো মুখোমুখি পথ আটকে। মুখে লম্বা দাড়ি মাথায় পাতলা সাদা টুপি। কারো মুখে কোন কথা নেই। দুজনেই দুজনের মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কয়েক মুহূর্ত।

আলমের মুখথেকে বেরিয়ে এল, "ভাই সাহাব!"

।। উনিশ ।।

আলমকে নিয়ে আফতাব উদ্দিন ফকির সাহেব শিবপুর গ্রামে পা দিতেই কথাটা বাতাসের আগে ছড়িয়ে গেল সারা গ্রামে। "নয় বছর পরে সাধু খাঁ-র হারানো ক্ষুদে ছেলেটাকে পাওয়া গেছে গো!" পাড়ার বৌ-ঝিদের মধ্যেও কথাবার্ত্তা শুরু হয়ে গেল। বেশ কিছুদিন ধরে আলমকে গাঁয়ের পথে দেখলেই তারা একে তাকে ডেকে দেউড়ির পাশে দাঁড়িয়ে ঘোমটার ফাঁকে দেখতে লাগল, "ঐ যে গো!"

তখন শহর সম্বন্ধে অদ্ভুত অদ্ভুত ধারণা ছিল গাঁয়ের লোকের। গাঁয়ের লোক ভাবত সেখানে ধর্ম্ম নেই কর্ম্ম নেই। যত রাজ্যের খারাপ লোকের বাস। শহর কোলকাতা? সেতো আরো অদ্ভুত।

কবর দেবার মত মাটি নাকি সেখানে নেই! সব সান বাঁধান! মাটি যে মাটি তাই সেখানে কড়ি দিয়ে কিনতে হয়! আর বাড়ি ঘর দোরের কথা! সেতো যে কোনো সময় ভেঙে পড়তে পারে তোমার মাথায়। পড়লেই অক্কা! কোলকাতা আদৎ শয়তানের রাজত্বি!

ইয়া অল্লা! সেই কোলকাতায় আলম নয় বছর কাটিয়ে এসেছে! পাড়ার ছেলে ছোক্‌রারা বড় একটা কেউ আলমের কাছে ঘেঁষে না। গুরুজনেরাও ছেলে-ছোকরাদের সাবধান করে দেয়। আলমকে নিরীহ গোবেচারার মত দেখতে হলে কি হবে, কে জানে ওর পেটে পেটে কি আছে?

কিন্তু গাঁয়ের ছেলেছোক্‌রারা দূর থেকে কৌতূহল আগ্রহ নিয়ে আলমকে লক্ষ্য করে। ও কেমন করে হাঁটে, কেমন করে কথা বলে, গাঁয়ের সাত-পাঁচ কথার মধ্যে কেমন করেই বা চুপ করে থাকে—সব লক্ষ্য করে তারা। কিন্তু কোনও হদীশ পায়না।

আলমের কোনো খেলা-ধূলার ঝোঁক নেই। গাঁয়ের আর পাঁচটা ছেলের সঙ্গে মেশেওনা তেমন। কেমন যেন মনমারা হয়ে একা একা চুপ করে থাকে। গৃহস্থ সংসারের কোনো কাজের কথা হলে মুখে 'না' নেই। মুখ বুজে করে যায়

ওর মনে যে আবার কি আছে তা কে জানে! মা, মধুমালতী দিদি বাড়ির সবাই ওর নীরব মুখের পানে চেয়ে যেন কেমন অস্বস্তি অনুভব করেন। প্রথম প্রথম ওঁরা ভেবেছিলেন দিন গেলে আপনা থেকেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

কিন্তু দিন যায়। কোনো পরিবর্ত্তন নেই। সব সময়ই যেন ওর সঙ্গে আর সকলের ব্যবধান থেকে যায়। ও যেন কোন্ এক দূরের লোক। সহজ কথার মানুষ ও নয়! ভেবে মা-র বুকের মধ্যে

যেন কেমন মোচড় দিয়ে ওঠে। এই ন'বছর পরে ছেলেকে কাছে পেয়েও যেন পান না। ও যেন পর।

পাড়ার লোকে বলে কোলকাতায় গেলে স্বভাব-চরিত্তির ঠিক থাকে না। তার ওপর থিয়েটার-যাত্রায় কাজ করেছে ও ছেলে। ও ছেলেকে কিসের বিশ্বাস!

এসব কথা মধুমালতী দিদির কানে উঠলে কোমর কাপড় বেঁধে গায়ের ঝাল মিটিযে পাড়াপড়শীদের সঙ্গে ঝগড়া করে আসেন তিনি। কিন্তু বাড়ী এসে ভায়েব ঐ নীরব উদাসী মুখখানার দিকে চেয়ে যেন অকারণে তাঁর ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছা হয়।

।। বিশ ।।

এমনি করে দিন কাটে। কোনো উপায় হয়না। একদিন পাড়ার বুড়ো ঠানদি, সনের মত সাদা তার মাথার চুল আলমের মাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললে, "আলমের মা ব্যাটার কথা ভেবে অমন মন খারাপ করো না। ব্যাটার বিয়ে দাও। বিয়ে দিয়ে ব্যাটার বউ ঘরে আন দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে।" মুচকি হেসে বুড়ি কথা শেষ করলে।

সবাই মিলে পরামর্শ করে শেষে তাই ঠিক হল। মধুমালতীদিদি উদ্যোগী হয়ে সব ঠিকঠাক করতে লাগলেন। বাবার কাছে প্রস্তাব রাখা হল। বাবা বললেন "আলমের বিয়েতো আমি ওর জন্মের আগে ঠিক করে রেখেছি। ওর বিয়ে দিলে দিতে হবে তোমার বসির চাচার মেয়ে মদনমঞ্জরীর সঙ্গে।"

বসির চাচাও এক কথাতেই রাজী হয়ে গেলেন। ও ছেলে শহরে গেছে থিয়েটারে কাজ করেছে, গান বাজনা করে—এ সব কথা

বসির মহম্মদের কানেও কেউ কেউ লাগাল। কিন্তু তিনিও বললেন, "আমরা দুই বন্ধুতে যা চুক্তি করেছি তা পালন করবই।"

খুব ধুমধাম করে বিয়ে হয়ে গেল। তখন আলমের বয়স বড় জোর পনেরো কি ষোল আর মদনমঞ্জরীর বয়স হবে নয়। নাকে নোলোক-পরা মদনমঞ্জরী কনে হয়ে এল আলমের বাড়ি। বড় মায়াভরা মেয়েটির মুখের গড়ন। কনে দেখে বাড়ির সবাই খুশি। মা মনে মনে নিশ্চিন্ত হলেন ছেলের কথা ভেবে।

রাত্রি গভীর হতে লাগল। বিয়ে বাড়ির কাজ কর্ম্ম ধুমধাম একে একে শেষ হল। বর কনের ঘরে তেলের বাতি জ্বলছে মিটমিট। আলম আস্তে আস্তে মাথা তুলে দেখলে। তখন মদনমঞ্জরী ঘুমিয়ে কাদা। এই দু'দিন বিয়ের ধকল তো কম যায়নি। ঘুম ঘোরেও যেন লজ্জা জড়ানো মেয়েটির বড় অসহায় কচি মুখ। ঠোঁটের পাটি একটু হাঁ হয়ে আছে। নাকের নোলকে মিটমিট আলো পড়ে মাঝে মাঝে চিক চিক করে উঠছে। ওর শিয়রে রঙিন কাপড়ে পুঁটলি করে বাঁধা রয়েছে বিয়েতে পাওয়া যৌতুকের টাকা। আলম শয্যা ছেড়ে উঠে আস্তে আস্তে সেই পুঁটলিটা তুলে নিয়ে নিঃশব্দে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। মেয়েটি টেরও পেলে না।

* * *

প্রথম যেদিন আলম বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল তখনও ছিল এমনি নিঝুম নিশুতি রাত্রি। চারিদিকে কোথাও সাড়া শব্দ নেই। শুধু ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে ঝিঁ ঝিঁ করে। ছায়ায় যেন তেমনি ছায়ার মত দাঁড়িয়ে আছে গাছপালা। আলম হাটের পথে শিমূল গাছের বাঁক ছাড়িয়ে হাওরের পাশে এসে পড়ল। সেই হাওর। যার এ-মাথা থেকে ও মাথা দেখা যায় না। সেই দম-আটকানো ভয় আর সেই। তবু গাটা কেমন শির শির করতে লাগল। আলম

মনে মনে হিসাব করতে লাগল, এই টাকায় কি কি বাজনা কিনবে। প্রথমবার ও যখন ঘর ছাড়ে তখন ওর হাতে ছিল মার হাঁড়ির থেকে নেওয়া বার টাকা। এবার এই পুঁটলিতে মেলাই টাকা হবে। টাকার মালিক ঐ ঘুমন্ত লাজুক ক্ষুদে মেয়েটির কথা ভেবে একবার বড় মায়া হল আলমের। কিন্তু ওকেতো কর্নেট একটা কিনতেই হবে। আর তা শিখতে হলে যেতে হবে হুলোবাবু, নন্দীবাবুর কাছে। কর্নেটের কথা বললে বলতে হবে এঁরাই কোলকাতার সেরা কর্নেট বাজিয়ে। বেহালাও একটা চাই। এ সব কথা ভাবতে ভাবতে আলম কখন এসে পৌঁছল মানিক নগরের লঞ্চের ঘাটে। নারায়ণগঞ্জে যাবার লঞ্চ সিটি দিয়ে এসে দাঁড়াল ঘাটে।

তখনও ভোর হয়নি। মদনমঞ্জরী তখনো ঘুমে। আলম নতুন সুরের সন্ধানে আবার ঘর ছাড়া হয়ে বেরিয়ে পড়ল পৃথিবীর পথে।

॥ এক ॥

বাড়ির মধ্যে মা-ই ওঠেন সকলের আগে। প্রায় রাত থাকতে। সেই সাতসকাল থেকেই তাঁর দিনের কাজ সুরু হয়। কিন্তু আজ কাজ করতে কেমন যেন অচল হয়ে যান। যাক ব্যাটাকে সংসারের জোয়ালে বাঁধা গেল এতদিনে। কিন্তু নিশ্চিন্ত হয়েও মনটা যেন একটা অজানা ভয়ে ছাৎ ছাৎ করে।

একটু সকাল হলে মধুমালতি দিদি বিয়েতে নায়র এসেছিল, আলমের ঘরের সামনে গিয়ে প্রথম বলে উঠল, "ও মা গো! দরজা যে খোলা! আলম কই?"

বাড়ির তখন অনেকেই ঘুম থেকে উঠেছে। আলমকে না দেখতে পেয়ে সবাই এ ওর মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগল। সকলের মনে

অন্তরা

বিদেশ বিভুঁই
বিবাহ-বাসর রইল পড়ে

এক কথা—কেউ বলতে সাহস করল না যদি মনের কথাই সত্যি হয়ে ওঠে। বেলা যত বাড়তে লাগল—সেই আমোদ আহ্লাদে ভরা বাড়িটা কেমন যেন চুপ মেরে গেল। লোকজন কেমন যেন ফিসফাস করে কথাবার্তা বলছে। মদনমঞ্জরী চারদিকের এই ভাব দেখে ভয়ে ভয়ে এসে দাঁড়াল শ্বাশুড়ির আঁচল ধরে। মা আর থাকতে পারলেন না, হাউ হাউ করে কেঁদে বলে উঠলেন, "তোমরা চারিদিকে লোক পাঠিয়ে দেখনাগো ছেলেটা কোথায় গেল!

কোথায় আর দেখবে!

শেষপর্যন্ত তাই হল। আলম ফের বাড়ি থেকে পালিয়েছে। বেচারী মদনমঞ্জরী! নয় বছরের বৌ, তার ডান-বাঁ কি জ্ঞান আছে। বিয়ের সময় দশজনে যা দিয়েছিল—শ্বাশুড়ি তা পুটলি বেঁধে রেখে দিয়েছিল তার শিয়রে। পঞ্চাশ টাকার কম হবে না। আলম তার এই যথাসর্বস্ব নিয়ে দে চম্পট!

কথা নেই বার্তা নেই ঘর ছেড়ে পালিয়ে বেড়ান যেন এ বংশের ধারা। মুলুকগ্রামের ঘর-পালান দীননাথ দেবশর্ম্মার রক্ত এদের দেহে।

বৌ মরে অনেকেরই, কিন্তু তারাও সংসার-বাস করে। আবার বিয়ে থা করে, ছেলেপুলে হয়। কিন্তু ঐ দীননাথ শর্ম্মার বৌ ম'ল আর যেন তিনি পাগল হয়ে উঠলেন। বৌ হারিয়ে এই সংসার-বাস মনে হতে লাগল সব মিছে! আর কেন! কার জন্যে এখানে পড়ে থাকা। শোকে দুঃখে দীননাথ একদিন তার একমাত্র ছেলের হাতধরে পাড়া-পড়শী কাউকে কিছু না জানিয়ে গৃহত্যাগী হলেন। এ সংসার-বাসে আর নয়। তিনি চলে গেলেন জন মানবের বসতি ছাড়িয়ে আসামের গভীর অরণ্য ঘেরা পাহাড়ে। সেই কুকীদের দেশে।

কুকীদের আচার আচরণ তখনো ছিল সেই আদিম যুগের মানুষের মত। ওরা দলবেঁধে পাহাড়ে জঙ্গলে বাস করে, বনের পশুপক্ষী শিকার করে খায়। নিজের বাপ-মা বুড়ো হলে তাদেরও নাকি খেয়ে ফেলে। বলে, "বাবা মা আমাদের পেটে রেখেছিলেন, এবার আমরাও তাদের পেটে রাখলাম।"

তাদের মধ্যে আবার আর একদল ছিল, যারা মানুষের মাথা কেটে ঝুলিয়ে রাখত যে যার ঘরের চারিদিকে। যে য'টা মানুষের মাথা ঝুলিয়ে রাখতে পারবে তার ঘরের সামনে—সে নাকি তত বড় বীর, তত বড় মানি ব্যক্তি। এমনি ছিল তাদের রীতিনীতি।

জনমানব শূন্য, ভয়ঙ্কর কুকীদের দেশে পাহাড় ঘেরা অরণ্যের গভীরে দীননাথ কুটির বাঁধলেন। ভয়ডর লেশ। পাহাড় চুড়ায় কালীমন্দির স্থাপন করলেন। পাথর কেটে মূর্ত্তি গড়লেন। কালীপূজো করেন, আর ছেলেকে সংস্কৃত বাংলা শিখিয়ে মানুষ করে তুলতে লাগলেন।

একদিন কুকীরা দূর থেকে দেখল ঐ অরণ্য ঘেরা নির্জন পাহাড়ে ঐ মন্দিরকে, পূজারী ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী ঐ দীননাথকে। মন্দির থেকে হোমের ধোঁয়া উঠছে পাকিয়ে পাকিয়ে। দেখে ভয়ে ক্ষুদে ক্ষুদে চোখ মেলে এ ওর মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। এক বৃদ্ধ কুকী তড়তড় করে উঠে যায় গাছের মগ ডালে। সেখান থেকে হাতের চেটোয় পড়ন্ত সূর্য্যের আলো আড়াল করে মুখ বিকৃত করে কপাল কুঁচকে অনেকক্ষণ ধরে দেখে। তারপরে গম্ভীর মুখে নেমে এসে তাদের ভাষায় বললে, "দেবতার কোপ পড়েছে এই বনে। দেবতা তুষ্ট না হলে আমরা ধ্বংস হয়ে যাব। দেবতাকে তুষ্ট কর।"

দু'একজন সাহসী এগিয়ে গিয়ে বুঝে নিল ব্যাপারটা। ধীরে ধীরে তাদের সংশয় দূর হল। নানা ফল মূল ভেট নিয়ে এসে দাঁড়াল

মন্দিরের দ্বারে। নগ্ন খাড়া হাতে উর্দ্ধবাহু বীভৎস আদিম দেবতার কাছে তারা মাথানত করল। দীননাথের কালীমন্দিরকে ঘিরে রইল কুকীরা। দূরদূরান্ত থেকে কুকীরা এল ঠাকুর দর্শনে।

দীননাথের ছেলেকেও কুকীরা বড় ভয়-ভক্তি করতে লাগল। সেই অরণ্য ঘেরা নির্জন পাহাড়ে ঐ কুকীদের সঙ্গে মিশে একটু একটু করে বড় হয়ে উঠতে লাগল। তাদের সঙ্গেই বনে বনে বেড়ায় ঘুরে। তাদের সঙ্গেই খাওয়া, বসা, ওঠা, শিকার করা। যেন কুকীদের সর্দ্দার।

॥ দুই ॥

তখন ১৭৭৬ সাল। ইংরেজ কোম্পানি ও জমিদারদের শাসন শোষণের কুফল সুরু হয়েছে দেশে। চারিদিকে হাহাকার। দুর্ভিক্ষ। না খেতে পেয়ে পথে ঘাটে লোক মরে পড়ে থাকছে। তারপর সুরু হল ওলাওঠা, বসন্ত। অপথ্য কুপথ্য করে লোক মরছে চারিদিকে। দেশটা যেন উজাড় হয়ে যাবে।

সেই দীননাথ দেবশর্ম্মার ছেলে তখন শক্ত সমর্থ জোয়ান। সত্যি সত্যিই কুকীদের সর্দ্দার। হাতে বর্শা, কাঁধে তীর ধনুক। বনে বনে শিকার করে ফেরে। মানুষের বিপদে আপদে বুক দিয়ে পড়ে। কুকী জোয়ানরা তাকে পিতা বলে মানে। বলে দেবতা। সব সময় তারা ছায়ার মত ঘোরে দেবতার পিছু পিছু।

ইতিমধ্যে শুরু হয় সন্ন্যাসী বিদ্রোহ। উত্তরবঙ্গে গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীরা ইংরেজ কোম্পানির শাসন মানতে চায় না। ইংরেজরা কোথাকার কে? সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার থেকে উড়ে এসে

জুড়ে বসেছে। আমরা শুনবো না ওদের কথা। মানবো না ওদের শাসন। ভবানী পাঠক, দেবীচৌধুরাণী নামে ইংরেজদের থরহরিকম্প। ওরা বিধর্মী ম্লেচ্ছ।

ইংরেজরা সৈন্য সামন্ত কামান বন্দুক নিয়ে আসে ঐ সন্ন্যাসীদের বিদ্রোহ ঠাণ্ডা করবার জন্যে। সন্ন্যাসীরাও কম যায় না। তারাও ইংরেজ সৈন্যদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। সম্মুখ সমরে না পেরে উত্তরবঙ্গের বনে জঙ্গলে লুকিয়ে থেকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যায়। কালী মন্দির প্রতিষ্ঠা করে। সেখানে দীক্ষা নেয়, মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন। কিছু পালিয়ে যায় আসামে। সেই কুকীদের রাজ্যেও সন্ন্যাসী বিদ্রোহীদের বার্তা পৌঁছে যায়। তখন দীননাথ দেবশর্ম্মা মারা গেছেন।

বাপের স্থান নিয়েছে ছেলে, সেও সন্ন্যাসী। উত্তর বঙ্গের সন্ন্যাসীদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলে, আমিও মানব না ইংরেজ কোম্পানির আইন। ইংরেজরা অচিরেই খবর পায় কে এক তরুণ সন্ন্যাসী বিদ্রোহী কুকীদের সর্দ্দার, ইংরেজের খাজনা লুট করে বিলিয়ে দিয়েছে গরীবদের মধ্যে। আসামে ইংরেজ কোম্পানির প্রতিভূ কাউকে দেখলে চোরাগোপ্তা আক্রমণ করে তাকে ধরাশায়ী করছে। অত্যাচারীর মুণ্ডপাত করছে।

ইংরেজরা ঐ দুর্দান্ত সন্ন্যাসী ডাকাতকে ধরবার জন্যে নানা কূট-কৌশল করতে লাগল। আসামের বনসম্পদের ওপর ইংরেজদের লোভের অন্ত নেই। এই সন্ন্যাসী বিদ্রোহীদের ঠাণ্ডা না করতে পারলে তাদের লোভ চরিতার্থ হয় না। ঐ তরুণ সন্ন্যাসীকে ধরবার জন্যে চারিদিকে হুলিয়া জারি করল। যে জ্যান্ত অথবা মৃত ধরতে পারবে তাকে পুরস্কার দেওয়া হবে। আসামের বনে জঙ্গলে বন্দুকধারী সেপাইরা হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

একদিন খবর পেয়ে এক বিরাট সৈন্য বাহিনী এসে ঘিরে ফেলল ঐ সন্ন্যাসীদের আস্তানা। প্রচণ্ড লড়াই হল বিদ্রোহীদের সঙ্গে। গুলি আর বারুদের গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে উঠল। তীর ছুটল শন্‌শন্‌ করে। সন্ন্যাসীদের অস্ত্রশস্ত্র ছিল কম, সংখ্যায় ছিল তারা অল্প। লড়াইয়ে তারা হেরে গেল, অনেক গেল মারা। প্রচণ্ড ভাবে আহত হল তাদের নেতা। গুলির ঘায়ে তার বাঁ কাধের কাছটা ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। কয়েকজন তাদের আহত নেতাকে কাঁধে করে সৈন্য বাহিনীর গুলি বর্ষণের মধ্যে দিয়ে পালিয়ে গেল গভীর অরণ্যে। সেই দুর্দান্ত কুকীদের সর্দ্দারটাকে ধরতে না পেরে সৈন্য বাহিনীর ইংরেজ সাহেব আফশোষে হাত কামড়াতে লাগল।

অচৈতন্য নেতাকে পাঁচ ক্রোশ দূরের এক অজানা গ্রামের প্রান্তে মৃত মনে করে ফেলে রেখে সন্ন্যাসীরা গেল চলে। তারপর থেকে সেই গৃহত্যাগী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দীননাথ দেবশর্ম্মার ব্যাটার খবর আর কেউ রাখে না।

আস্তে আস্তে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ স্তিমিত হয়ে গেলে ইংরেজদের খাতাতেও সে মৃত বলেই গণ্য হল।

একদিন গেল, কি দু'দিন গেল, কি তিনদিন গেল, খেয়াল নেই। অচৈতন্য অবস্থা। মাঝে মাঝে তন্দ্রাচ্ছন্নতার মধ্যে যেন বেজে উঠছে একটা রিণরিণে মিষ্টি সুর। কখনো বা অর্দ্ধজাগ্রত অবস্থা। বলতে চাইছে,—কোথায়?—কে? কেনই বা? কিন্তু কিছু বলতে পারছে না। চোখ মেললেই সব পরিষ্কার হয়ে যায়—কিন্তু চোখ খুলতে পারছে না কিছুতেই। কানে বাজছে সেই মিষ্টি রিণরিণে শব্দ।

একদিন সত্যিই সে চোখ খুলতে পারল। আর বিস্ময়ের শেষ রইল না। মনে হতে লাগল দূর—বহুদূর থেকে দেখছে, ভেসে আসছে রিণরিণে সুর—অথচ তার পাশেই, হাতের কাছে, যেন হাত

বাড়ালেই ধরতে পারে। শ্যামল স্নিগ্ধ একটি মেয়ে কোরাণ পাঠ করছে। সে শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগল—মনে করতে চেষ্টা করতে লাগল। না পেরে নিজের ওপরই বিরক্ত হয়ে উঠল। আবার সে অচৈতন্য হয়ে পড়ল।

আবার কখন যে চোখ মেলল—আর হঠাৎই যেন দেখতে পেল, হঠাৎ কোরাণ পাঠ থামিয়ে মেয়েটি তাকাল তার দিকে—পলক যেন পড়ে না। মনে হতে লাগল যেন বহুক্ষণ ধরে অমনি করে তাকিয়ে আছে, তারপরে কাকে যেন ডাকতে লাগল। এক বৃদ্ধ, পাকা দাড়ি, এগিয়ে এসে তার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ল। তারপর মাথা নেড়ে কি যেন বলতে লাগল। খুশিতে তার চোখ দু'টো ছল ছল করছে।

শেষ পর্য্যন্ত সব ঘটনাই জানা গেল। এই ধর্ম্মপ্রাণ ফকির অচৈতন্য অবস্থায় সন্ন্যাসীকে এনে গ্রামের প্রান্তে নিজের গৃহে লুকিয়ে রেখে-ছিলেন আর তাঁর ষোল বছরের পালিতা বিধবা কন্যা নয়তন অক্লান্ত সেবা যত্নে তাঁকে বাঁচিয়ে তুলেছিল। তখনকার দিনে সন্ন্যাসীদের আশ্রয় দেওয়ার ফল ভাল করেই জানা ছিল। সন্ন্যাসীদের গন্ধ পেলে ইংরেজ সৈনিক এসে দাঁড়াত বন্দুক উঁচিয়ে। কাজেই ঐ ফকির সন্ন্যাসীর নাম পালটে দিয়ে প্রচার করলেন সীরাজুদ্দিন খাঁ বলে। সবাই জানল তাই। সন্ন্যাসীও আপত্তি করলে না।

ফকিরের কি যে মায়া পড়ে গেল এই তরুণ সন্ন্যাসীর ওপর। যখন সন্ন্যাসী ভাল হয়ে উঠল, বিদায়ের সময় এল,—তখন ফকির সন্ন্যাসীর হাত ধরে ধরা গলায় বললেন, "এমন করে বার বার কেন ঘর ছাড়া হও বাবা! পেছনের কান্নার শব্দ কি একটি বারও তোমার কানে পৌঁছয় না।"

সৌম্য নিঃশব্দ সন্ন্যাসী। হঠাৎই যেন শুনতে পেল বোবা কান্নার শব্দ। দেউড়ির পাশে দাঁড়িয়ে সত্যিই কাঁদছে কেউ। সন্ন্যাসীর

আর গৃহত্যাগ করা হল না। মাথা নত করে প্রণাম করল ফকিরকে। সীরাজুদ্দিন খাঁর সঙ্গে নয়তনের বিয়ে হয়ে গেল। সুখে শান্তিতে কাটল ক'বছর। নয়তনের কোলজুড়ে এল পুত্র সন্তান। তাঁর খুশি আর ধরে না।

কিন্তু ঘর-ছাড়ার ডাক রয়েছে রক্তে। কিছু দিন এমনি চুপচাপ থাকার পর ক্রমেই যেন সীরাজ কেমন হয়ে উঠতে লাগল। ঘর-ছেড়ে আসি বলে বেরিয়ে যায়—তারপর একদিন, দু'দিন, তিনদিন যায় হয়ত তার দেখাই নেই। অন্যায় অবিচার দেখলেই যেন তার মাথায় খুন চেপে যায়—ভুলে যায় ঘর সংসারের কথা। তার মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। তার সঙ্গে সঙ্গীও জুটে যায় একটি দু'টি করে।

আবার সেই পুরানো মূর্তি। যে কে সেই।

॥ তিন ॥

অচিরেই সীরাজু ডাকাতের নাম ছড়িয়ে পড়ে লোকের মুখে মুখে। ধনী-জমিদাররা সীরাজুর নামে কাঁপে থরথর করে। গরীবদের প্রতি সীরাজুর বড় দয়া। কারো কোন দুর্দশার কাহিনী শুনলে অমনি সীরাজু ডাকাতের দল গিয়ে হাজির হয়। বড় লোকদের কাছ থেকে লুট করে আনা অর্থ বিলিয়ে দেয় গরীবদের মধ্যে।

একদিন সন্ধ্যায় সিলেটের এক জমিদার বাড়িতে চিঠি এল, পত্র বাহককে দেখেই জমিদারবাবু মূর্চ্ছা গেলেন। পত্রবাহক উত্তরের

অপেক্ষা না রেখেই গেল চলে। নায়েব মশাই কাঁপতে কাঁপতে চিঠি খুলে পড়লে, তাতে লেখা—

"তোমার অত্যাচারে চারিদিকে হাহাকার উঠিয়াছে। প্রজারা নিজ গৃহ ছাড়িয়া দেশান্তরী হইতেছেন। তোমার উদর এত স্ফীত হইয়াছে যে তোমার চলৎশক্তি রহিত। আমি আজিকে রাত্রি দুইটার সময় আসিতেছি, তোমার ভার কিছু লাঘব করিব। ইতি,

—সীরাজু"

রাতদুপুর। চারদিক নিস্তব্ধ। থেকে থেকে দলবদ্ধ শেয়াল ডেকে উঠছে। অন্ধকারে জোনাকির আলোগুলো যেন ভয়ে ভয়ে মিট মিট করছে। জমিদার বাড়িটা যেন দম বন্ধ করে পড়ে আছে মরার মত। সেই নিস্তব্ধতা ভেঙে পাঁজর কাঁপানো চিৎকার উঠল 'হা রে রে-রে রে'—মশালের আলোতে চারদিক আলোকিত হয়ে উঠল।

সীরাজু ডাকাত ঢুকল আগে আগে, পেছনে ভূষো তেল কালি মাখা তার ডাকাতের দল। কিন্তু কেউ এসে টাকার থলি নিয়ে লুটিয়ে পড়ল না সীরাজুর পায়ে। যেমন হয়ে থাকে সব জায়গায়, টাকা দিয়ে প্রাণ ভিক্ষা করে। যারা বাধা দিতে আসে তাদের মুণ্ড পড়ে কাটা কিন্তু এখানে কেউ নেই কোথাও, দরজা জানালা হাট করে খোলা। সব ব্যাটা পালিয়েছে। ডাকাত দল এঘর ওঘর খুঁজতে লাগল।

সীরাজু দাঁড়িয়ে রইল চুপ। একটু ফাঁক করে কোমরে হাত দিয়ে। যেন পাথরে খোদাই মূর্তি। রাগে ফুঁসতে লাগল, "সব ব্যাটা পালিয়েছে। ঘর দোর ভেঙে ফেল।"

ধন-সম্পদ না পেয়ে ডাকাতরা তাণ্ডব সুরু করে দিল জমিদার বাড়িতে। সামনে যা পেল তাই ভেঙে ফেলতে লাগল। এক ডাকাত তার হাতের কুঠারটি দামি সেগুন কাঠেরপালঙ্কে বসিয়ে দিল। দু'তিন কোপ বসিয়ে দেবার পরই হঠাৎ থেমে গেল অস্ফুট নাকি স্বর শুনে। ভয় পেয়ে দু'হাত পিছিয়ে এল। সীরাজু পাশেই ছিল, সে ভীত ডাকাতকে পেছনে ঠেলে দিয়ে এগিয়ে গেল—জমিদার বাবুর খাস কামরায় বিশাল খাটের মধ্যে কাঁথা চাপা কি যেন একটা নড়ে চড়ে উঠেছ আর ঐ অস্ফুট নাকি শব্দ করছে। সীরাজুর পার্শ্বচর কৃপান উঠিয়ে ধরল এক কোপে বস্তুটিকে দু'ফাঁক করে দেবার জন্যে। সীরাজু হুঙ্কার দিয়ে উঠল, "খবরদার!"

তারপর ধীর পদক্ষেপে সে এগিয়ে গেল খাটের কাছে—একটানে কাঁথাটা সরিয়ে ফেলল। একটি ফুটফুটে মেয়ে। অপরিচিতের মুখের দিকে চেয়ে কান্না থামল। তারপরে কি ভেবে ফিক করে হেসে ফেলল! ভয় ভাবনার লেশ নেই। সীরাজু আস্তে আস্তে— মেয়েটা যাতে আবার কেঁদে না ওঠে সেই ভাবে কোলে তুলে নিল।

ডাকাতদল অবাক হয়ে তাদের নেতার কাণ্ডকারখানা দেখতে লাগল। এ যাত্রা সীরাজু ডাকাত ব্যর্থ হয়েছে ধনসম্পদ লুণ্ঠনে। মেয়েটিকে বুকে করে ফিরে যেতে হল ঘরে।

সেইদিন থেকে সন্ন্যাসী বিদ্রোহী, সীরাজু ডাকাত হারিয়ে গেল আর এক পরিচয়ে।

সেই শিশু কন্যাটিকে নয়তনের কোলে গুঁজে দিয়ে হাসতে হাসতে বলল, ব্যাটার বৌ নিয়ে এলাম।"

নয়তন অবাক হয়ে স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে রইল।

সীরাজু বললে' "কেমন মায়া পড়ে গেল।"

"মাগো! দুধের শিশু!" নয়তন ভয়ে মেয়েটিকে বুকের সঙ্গে আঁকড়ে ধরলে "নইলে কি মেরে ফেলতে?"

"বলা যায় না!"

"ও ঃ খোদা"

"আরে! মারতে পারলাম কৈ!"

"তোমারও দয়া আছে তা হলে!" নয়তন অভিমানে কেঁদে ফেললে। তারপর দৃঢ়স্বরে বললে, "ওকে আমি ব্যাটার বৌ করবই!" সীরাজু নয়তনের কাণ্ডকারখানা দেখে হাসে। নয়তন তারপরে অনুনয় করে বলতে থাকে, "অনেকতো হয়েছে আর কেন। চল আমরা এখান থেকে চলে যাই—দূরে, যেখান আমাদের কেউ চিনতে পারবে না। জমি জায়গা নিয়ে—আর দশজনে যেমন করে ঘর সংসার করে!"

সংগ্রাম, সংগ্রাম আর সংগ্রাম। একদিনের তরেও বিশ্রাম নেই সীরাজুর জীবনে। সেও যেন এখন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। সারাটা সন্ধ্যা চুপ করে রইল গুম্ হয়ে। শেষ পর্যন্ত রাজি হয়ে গেল। সেইদিন রাত্রেই ব্যাটা আর বৌকে কোলে নিয়ে কাউকে কিছু না জানিয়ে বৌ-এর হাত ধরে গ্রাম ছেড়ে চলে গেল। ঘর বাঁধল শিবপুরের নির্জন প্রান্তে। সেখানে অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটল সীরাজুর জীবনে। আবার সে গৃহদেবতা কালীকে প্রতিষ্ঠা করল। ধর্ম-কর্ম পুজো আর্চ্চা এই হল তার জীবনে ব্রত। কোরান পাঠ আর কালীপুজো দুই-ই চলল তার গৃহে।

চার

সেই সিলেটের জমিদার কন্যার সঙ্গে সীরাজুর ছেলের বিয়ে হয়ে গেল ধুমধাম করে। তখন সীরাজু তার যা পুঁজিপাটা ছিল তা দিয়ে ক্ষেত-খামার জমিজিরাত করেছে, নিঃঝঞ্ঝাট সংসার। আস্তে আস্তে শিবপুরের মানুষ—ঐ সৌম্য শান্ত নিরীহ সীরাজুদ্দিন খাঁকে দূর থেকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতে লাগল। তার অমায়িক স্বার্থবুদ্ধিহীন মধুর ব্যবহার সকলের মন জয় করে নিল। ঐ গৃহস্থ কৃষিজীবী বংশের পত্তন হ'ল এই শিবপুব গ্রামে।

সীরাজুর ছেলের আবার তিন ছেলে হ'ল—আলি মহম্মদ, সালি মহম্মদ ও জাফর মহম্মদ। জাফরের ছেলে মাদার হুসেন। তার ছেলে এই আলমের বাবা সদু খাঁ। গাঁয়ের দশজনে ডাকে সাধু খাঁ বলে। তারা ঠিকই ডাকে। যার অমন বংশের ধারা তার সাধু হওয়াই উচিত ছিল। তার বিয়ে থা করে সংসার-বাস করা কেন বাপু। আলমের এই সব অনাছিষ্টি কাণ্ড কারখানার মূলে যেন তিনিই বিরাজ করছেন।

আলমের মা কিছুতেই যেন ক্ষমা করতে পারছেন না আলমের বাবাকে। আত্মভোলা শান্ত নিরীহ মানুষ— কিন্তু এই বংশের ধারা যাবে কোথায়? আলমকে দেখলে কে বলবে, তার মাকে এমনি করে বার বার দাগা দেবে সে। অবাধ্য হবে। এই আট-দশ বছর ঘর ছাড়া নিরুদ্দেশ—কত লোক কত কথা বলেছে, কেউ বলেছে ও জাহাজের খালাসী হযে কোথায় গেছে তার কি ঠিক আছে? কেউ বলেছে ও ছেলেধরার খপ্পরে পড়েছে—এতদিনে ও-ও হয়ত একজন ওস্তাদ ছেলেধরা হয়ে গেছে ওর আশা আর কর কেন দিদি। কেউ বলেছে, ও নির্ঘাৎ ডাকাত হয়েছে, ও দেশে ফিরলে কারো ধড়ে আর মাথা থাকবে না। ও না

এসেছে ভালই হয়েছে। পূব পাড়ার মুখুজ্জেদের বাড়ীর সেজ ছেলের শ্বশুর বাড়ীর দিকের কোন আত্মীয় নাকি গিয়েছিল কোলকাতায়, তাদের বাড়ির লোকজন চোখ টিপে রহস্য করে বলতে লাগল - হুঁ হুঁ বাবা, সব জানা আছে, যার নাম বোম্‌কালী কোল্‌কাত্তাওয়ালী! ছোঁড়াটা সেই ফাঁদে পড়েছে গা।

কিন্তু আলমকে যখন আফ্‌তাবুদ্দিন ধরে আনলে বাড়িতে—মা দেখলেন গোলগাল সুন্দর কচি মুখে সবে দাড়ি গোঁফের রেখা দেখা দিয়েছে, তার দিকে একটু শক্ত ক'রে তাকালেও যেন ছেলেটা কি করবে দিশা পায় না, ভয়ে মরে। অবাধ্যতার চিহ্নমাত্র নেই। নেই কোন বদখেয়াল। মার এক একবার মনে হ'য়েছে, ও দিনরাত ঘরে না থেকে যদি পাড়ার বদ ছোঁড়াদের সঙ্গে মিশে টো টো করে বেড়াতো তাতেও যেন তিনি হাঁফ ছেড়ে বাঁচতেন।

আলম যতদিন ছিল, মার বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ-ছ্যাঁৎ করত—এই বুঝি যায়, এই বুঝি হারায়। ওর বড় ভাইটিও বাঁশী ফোঁকে আর দেওয়ানা হয়ে ঘুরে বেড়ায়। সংসারের দিকে দৃকপাত নেই। আজ এখানে কাল ওখানে পরশু সেখানে। গাঁয়ের লোক এখন থেকেই বলতে সুরু করেছে ওটা ফকির হয়ে গেছে, ফকির আফ্‌তাবুদ্দিন।

নাকে নথ, কানে মাকড়ি সাত বছরের বৌটি ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে শ্বাশুড়ির দিকে। শ্বশুড়ি বৌকে কোলে তুলে নিয়ে বুক ভাঙা-কান্নায় ফুঁপিয়ে ওঠে। বুঝতে বাকি নেই, আলমকে বৃথাই খোঁজা। মদনমঞ্জরী শ্বাশুড়ির কান্না দেখাদেখি কাঁদতে সুরু করে দেয়। তার চোখের জলের সঙ্গে নাকের জল মেশে।

আত্মভোলা আলমের বাবা তখন গৃহদেবতা কালীঠাকুরের সামনে সেতার নিয়ে বসেছেন।

॥ পাঁচ ॥

তবে এবার পথঘাট চিনে চলতে আলমের তেমন মুস্কিল্‌ হল না। ভয় ডর কম। সঙ্গে আরবারের চেয়ে টাকাও আছে বেশী। সেবার বাড়ির জন্যে মন কেমন করার কারণগুলি ছিল অস্পষ্ট অব্যক্ত, এবার তা' বেশ কিছুটা পরিস্কার। কিন্তু কোলকাতার কোলাহলে অচিরেই বাড়ির কথা গেল ভুলিয়ে। হাঁ, পথ দেখে সাবধানে চলতে হবে। এই টাকাক'টা গেলেই গেল। সর্বনাশ।

দু'দিক দেখতে দেখতে হ্যারিসন রোড ধরে সে চলল গঙ্গার দিকে। এবার আর জামা-কাপড় কারো কাছে জিম্মা রেখে সে স্নান করতে নামল না। চারিদিক দেখে শুনে কোমরে বাঁধা টাকা ক'টা টিপে টিপে দেখতে লাগল বারে বারে। থাক এবার গঙ্গা স্নান। আগের কাজ আগে। ডান দিকে মোড় নিলে, সোজা চলে এল চিৎপুরে। খাওয়া-দাওয়া নেই। দোকান পাট সবে খুলেছে। দোকান খুলতেই আলম এসে দাঁড়াল বিনীতভাবে।

এই বাদ্যযন্ত্রের দোকানির কাছে আলম পরিচিত। মিনার্ভা থিয়েটারে কাজ করার সময় থেকেই এরা আলমকে চেনে। তবলার গাব লাগানো—এটাওটার জন্য আলমকে এই দোকানে আসতে হ'ত। তা'ছাড়া সময় পেলে-ই আলম এখানে চলে আসত। বসে বসে বাদ্যযন্ত্র তৈরী করা দেখত। নিজেও মাঝে মধ্যে সুর মিলিয়ে দিত। দোকানি এই বিনয়ী নম্র ছেলেটাকে ভালই বাসত। সে বললে, "আরে প্রসন্ন যে—এতদিন কোথায় ছিলে। এই সাত সকালে কি মনে করে গো?"

"প্রসন্ন" ডাক শুনে আলমের বুকের মধ্যে যেন কেমন করে উঠল। সে দিন মিনার্ভা থিয়েটারে রাশ ভারী গিরিশচন্দ্র ঘোষের

সামনে সে কি ভাবে দাঁড়িয়েছিল! আজ মনে হতেও তার বুক কাঁপে। গিরিশ বাবু আলমের তবলা শুনে ঘাড় কাত করে বলেছিলেন, "হুঁ, ছোঁড়া বাজায় ভাল। তবে ওই আলম-ফালম থিয়েটারে চলবে না, ওকে পেসন্ন করে দাও।" সেই থেকে আলমের চাকরি থিয়েটারে। নাম প্রসন্ন বিশ্বাস। থিয়েটারের নাচের মেয়েগুলি আলমের চিবুক ধরে আদর করে বলত, "তোকে ছাড়া এই থিয়েটারে আমরা কাউকে বিশ্বাস করিনেকো। আহারে! নেলা ক্যাবলা! বেচারা।"

আলম মাথা নিচু করে মিটি মিটি হেসে দোকানিকে বললে, "আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি পেসন্ন। একটা বেহালা কিনমু।"

দোকানি একটু অবাক হ'ল। সত্যি বলছে তো। কিন্তু আলম ততক্ষণে তার কোঁচড় থেকে কাঁচা টাকাগুলি টিপে টিপে বের করে খুলে রাখল, দোকানির সামনে। ভাবখানা—এ ছাড়া আর কি হতে পারে দোকানি মশাই।

সাত সকালে এমন একটা খদ্দের পেয়ে দোকানি খুশি হয়ে উঠল। বেছে বেছে একটা বেহালা বের করে দিলে। জানে, ছোক্‌রার কাণ বড় তুখোড়—ওকে ফাঁকি দেওয়া যাবে না। আলমের হাত উত্তেজনায় কাঁপে। এটা তার নিজস্ব, একেবারে তার একলার। সে নিজের চোখকেও যেন বিশ্বাস করতে পারে না। বেহালার ছড় নিয়ে দু'টো টান দিতেই দোকানি মাথা নাড়তে লাগল, 'হ্যাঁ, বাবা, এ বেহালা তোমার হাতেই সাজে।"

বেহালা কিনেও আলমের কয়েকটা টাকা উদ্বৃত্ত হল। সে কি খাবে, কোথায় থাকবে—অগ্র-পশ্চাৎ কিছুই বিবেচনা করলে না। একটা ক্লারিওনেট-ও কিনে বসল। দোকানি আলমকে জড়িয়ে ধরে বলল, "বাবা, তুমি একদিন ভারতবর্ষ জয় করবে।"

তখন একথা বোঝার মত আলমের মনের অবস্থা নয়। বারে বারে ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখছে বাদ্যযন্ত্রগুলো। রাস্তায় বেরিয়ে দু'তিনবার বেহালার বাক্সটাও শুঁকে দেখলে। আলমের ইচ্ছে হ'ল পালিয়ে গিয়ে কোথাও লুকিয়ে থাকে। ভয় হয়—পাছে তার এই সৌভাগ্য কেউ কেড়ে নেয়।

কিন্তু তারপর? পূর্বপরিচিত জায়গাগুলি সব একে একে ঘুরে এল। সেই পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর বাড়ি। যেখানে নুলোগোপালের কাছে সে কাটিয়ে গেছে সাত বছর। ছাতুবাবুর বাজারের কাছে ডাক্তার বিশ্বাসের বাড়ি। আহা! ওনার বাড়িই ছিল কোলকাতায় তার প্রথম আশ্রয়। মিনার্ভা থিয়েটার। আলম ঘুরছে। ঘুরছে যেন উদ্দেশ্যহীন। তার একমাত্র উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে ঐ বেহালার মধ্যে—তারপর কি করবে সে একটিবারের জন্যেও ভাবেনি। বাড়ি থেকে এত কাণ্ড করে এল..., না, একবারের তরেও না।

কিন্তু বেলা যতই বাড়তে লাগল আলম ততই টের পেতে লাগল তার পেটের টান। বেলা গড়িয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করতে লাগল। আলমের হাতে তখন একটা কানা কপর্দকও আর নেই যে কিছু কিনে খাবে। বেহালা ও ক্লারিয়নেটকে সে শক্ত করে বুকের কাছে আঁকড়ে ধরল। যেন ভুলেও ওদের দোষারোপ না করা হয়। সেদিন বেহালা রেখে গঙ্গায় নেমে তার স্নান করাও হ'ল না। মা, গঙ্গা মাথায় রইলেন।

শেষপর্যন্ত সেই ছাতুবাবুর বাজারের লঙ্গরখানাই তার একমাত্র ভরসা। সেই পুরাণো জীবন। দিনে লঙ্গরখানা রাত্রে সরকারি কলের জল। তারপরে অকল্যাণ্ড হাউসের বারান্দা। লঙ্গরখানার খিচুড়ি আলম বেশ পেটপুরেই খেল। তারপর আস্তে ধীরে হাঁটতে হাঁটতে আবার চলে এল গঙ্গার ধারে। তারপরে এক নির্জন গাছের

ছায়ায় চুপচাপ বসে রইল। শোবার সাহস হয় না, পাছে ঘুমিয়ে পড়ে—বাদ্যযন্ত্র হাত ছাড়া হয়ে যায়। আলম কল্পনাও করতে পারে না সে কথা। বেহালা। আর ক্লারিওনেটটা কোলের ওপর রেখে সস্নেহে তাদের হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। যেন ওরা ঘুমোক, আমি জেগে থাকি।

ভাবতে ভাবতে এক সময় মদনমঞ্জরীর কথা মনে পড়ল। ওর টাকাতেই এই কেনাকাটা। কিন্তু বেচারা জানতেও পারল না। ভেবে কেমন যেন আমোদ পেল আলম। ঘুম ভেঙ্গে উঠে যখন দেখবে তার স্বোয়ামি নেই!— আলমের হাসি পায়। মেয়েটা ঘুমোবার আগে বলেছিল,

"দেখি আপনার হাত।"

"কেন?"

"বাবা বলে দিয়েছে—আমি যেন আপনাকে ধরে রাখি। আপনি নাকি খালি পালাই পালাই কর।"

হাত ধরে মেয়েটা পরমুহূর্তেই ঘুমিয়ে কাদা।

আলম এমনি সব কথা ভাবতে ভাবতে কখন যেন শিবপুর গ্রামে পৌঁছে গিয়েছিল। ওদিকে গঙ্গার ওপারে পাটকলের চিমনির পাশ দিয়ে তখন সূর্য ডোবে ডোবে। আলম তার বাদ্যযন্ত্র নিয়ে তড়াক করে লাফিয়ে উঠল—তারপর তড়তড় করে হেঁটে চলল প্রথমে দক্ষিণে—তারপর পূবমুখো।

॥ ছয় ॥

আলমের দশা হ'ল যেন বেড়ালের মত। বেড়াল যেমন তার সদ্যজাত ছানা-পোনা নিয়ে কি করবে ভেবে পায় না। একবার এখানে নিয়ে রাখে, একবার ওখানে নিয়ে রাখে। বৃথাই উত্তেজনা। সে বেহালায় একবার ছড় টেনেও দেখল না বা ক্লেরিওনেটে একটা ফুঁও দিল না। সঙ্গে নিয়ে কেবল ঘুরে ঘুরে বেড়ালো।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। রাত কত হ'ল? আলম কখন এসে দাঁড়িয়েছে তার বেহালার গুরু লবো সাহেবের বাড়ির সামনে। এদিক থেকে ওদিক থেকে উঁকি-ঝুঁকি মারে। মেমসাহেবকে দেখা যায় কিনা। আলমের সাহেবকে বড় ভয়। সাহেব রাশভারি মানুষ। তারপর মদ খেয়ে যখন চোখ দু'টো লাল হয়ে ওঠে তখন আলমের বুক শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়। কিন্তু মেম সাহেব? যেন মমতাময়ী মা। তাঁর দয়াতেই আলম লবো সাহেবের কাছে বেহালা শিখতে পেরেছে, তিনিই দয়াপরবশ হয়ে নিজের বেহালা দিয়েছিলেন আলমকে বেহালা শেখার জন্যে, হাতে ধরে শিখিয়েছেন ইংরেজি "নোটেশন।"

সেই মেমসাহেবের সঙ্গে দেখা করার জন্যে আলমের মনের মধ্যে আকুপাঁকু করতে লাগল আলমের এই নিজস্ব বেহালা দেখে মেমসাহেবের মুখের ভাব কিরকম হবে, সে কি বলবে এইসব ভেবে আলম অধীর হয়ে উঠল। কিন্তু বাড়ির কোথাও মেমসাহেবের সাড়া-শব্দ পেল না। সাহেব আছে। মদের গ্লাসের শব্দ থেকেই তার হদিশ পাওয়া যায়। আলমের মনে হল আজ যেন বড়ই বেশি খাচ্ছে। আলম বাড়ির পাশে পায়েচলা পথে ফণীমনসার ঝোপের মধ্যে বসে সবই শুনছে। রাত কত হ'ল? আস্তে আস্তে চারদিক নিস্তব্ধ হয়ে

গেল। গাড়ি-ঘোড়ার শব্দ এদিক ওদিক থেকে মাঝে মধ্যে শোনা যায়। আলম এক সময় বেহালাটা বা'র করে টুংটাং করে সুর মেলাতে লাগল, তারপর একসময় নিজের অজান্তেই টান দিল সুরে। নিশুতি রাত। কতক্ষণ বাজিয়েছে, আলমের খেয়াল নেই। যখন খেয়াল হয়েছে তখন দেখে তার পেছনের দরজা খুলে গেছে, লবো সাহেব সামনের দিকে দু'হাত বাড়িয়ে ইংরেজিতে পাগলের মত অধীর হয়ে কি যেন বলছে, টলতে টলতে চৌকাঠ-দরজায় হোঁচট খাচ্ছে। দরজা খুলে যেতেই ঘরের আলো এসে পড়ল আলমের ওপর। সাহেব কা'কে দেখতে এসেছিল, কিন্তু আলমকে দেখে যেন ভেঙে পড়ল, "ওহ্ আলম!" সাহেব জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। লবো সাহেবের বাবুর্চি সঙ্গে সঙ্গেই ছিল, সে ধরে ফেলল। তারপরে বাবুর্চি আর আলম ধরাধরি করে সাহেবকে তার নিজের বিছানায় নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিল।

বাবুর্চি সাহেবের মোজা খুলতে খুলতে বলল, "কিছুদিন হল এই-ই চলছে।" আলমের মুখে কোন কথা সরে না। গুরুর এই অবস্থা দেখে তার কান্না পেল। বাবুর্চি বলল, "মেমসাহেব তালাক দেবার পর থেকেই সাহেবের হয়েছে এই দশা। দিনরাত মদ গিলছে আর—"

সাহেব শ্লথ ভাবে হাত তুলে জড়িত কণ্ঠে বিড় বিড় করে কি যেন বলল, বোঝা গেল না তারপর ধপাস্ করে হাতটা পড়ে গেল। আর কোন সাড়া শব্দ নেই। একটা অসহায় কাতর অবস্থা। আলম নিঃশব্দে বেরিয়ে এল। আলম সাহেবকে বড় ভক্তি করত। যতক্ষণ সাহেব বেহালা বাজাত আলম তন্ময় হয়ে তা শুনত। তার প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের নাড়াচাড়াও আলম শিখে নিয়েছিল। অন্যমনস্ক হয়ে গুরুর শিক্ষা এক মুহূর্তের জন্যেও বিফলে যেতে দিত না। কিন্তু গুরু শিষ্যের মধ্যে কথাবার্তা হত খুব কমই গুরুর শিয়রের

পাশে বসে আলমের বলতে ইচ্ছা করছিল, "আমি আপনার কি কাজে লাগতে পারি বলুন, আমি তাই করব।" কিন্তু কিছুই বলা হল না। বিষাদভরা মন নিয়ে অক্‌ল্যাণ্ড হাউসের দিকে হেঁটে চলল। রাত কত হয়েছে। হদিশ নেই।

যতে যেতে তার মমতাময়ী মা মেমসাহেবের ওপর অভিমানে আলমের মনটা ভরে গেল। আবার কেমন একটা ব্যথাও অনুভব করতে লাগল মেমসাহেবের ওপর। কত দুঃখেই না বেচারীকে এ ঘর ছেড়ে যেতে হয়েছে। কে জানে। আলম দু'হাতে কান স্পর্শ করল। গুরুর খেলাপ কোন চিন্তা যেন তার অজ্ঞানেও মনে উদয় না হয়। সে মনে মনে লবো সাহেবকে প্রণাম জানাল। সে যা শিখিয়েছে তার-ই বা তুলনা কৈ? আলম সে রাত্রে বেহালা মাথায় গুঁজে অক্‌ল্যাণ্ডের বারান্দায় শুয়ে নানা উলটো পালটা স্বপ্ন দেখে কাটাল। এই অস্থিরতার কারণ—আলমের অবচেতন মনে এ কথা বেশ পরিষ্কার হয়েই উঠেছিল যে মেমসাহেব নেই, আর তার লবো সাহেবের কাছ থেকে কিছু পাবার আশাও নেই।

ভোর রাত্রে প্রথম পাখির ডাকের সঙ্গে সঙ্গেই আলম উঠে পড়ল। স্নান সেরে শুদ্ধ হয়ে বসে গেল বেহালা নিয়ে। তন্ময় হয়ে ডুবে গেল বেহালাতে। পূব দিক ফর্সা হয়ে আসছে। অদৃশ্য সূর্য্যের আভায় উজ্জ্বল সিঁদূরে লাল আকাশের দিকে চেয়ে বাজনা থামিয়ে চুপ করে বসে রইল। মনটা কিছুতেই যেন শান্ত হচ্ছে না। কিসের জন্যে যেন আঁকু-পাঁকু করছে। সাত সকালে উঠেই আলম রওনা দিল আর এক গুরুর উদ্দেশ্যে আর এক দিকে।

কলকাতায় তখনও গাড়ি-ঘোড়া ভাল করে চালু হয় নি, আলম এসে দাঁড়াল সিমলায় দত্ত বাড়ির সামনে। লোকে লোকারণ্য। আলম কিছুই বুঝে উঠতে পারল না, এই সাত সকালে এখানে

ব্যাপারটা কি ? ভলান্টিয়াররা হৈ হৈ করে লোক তাড়াচ্ছে। আলম অনেক কষ্টে ঠেলেঠুলে এসে দত্ত বাড়ির চৌকাঠ ধরে দাঁড়াল। বিরাট হৈ চৈ। রোদ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আস্তে আস্তে ভীড় পাতলা হয়ে এল। আলম ইতি-উতি করে শুধু এই টুকুই বুঝল— দত্ত বাড়ির কোন ছেলে ছুনিয়া জয় করে ঘরে ফিরেছিল, আবার সে ঘর ছাড়া হয়ে বেরিয়ে গেল। গেরুয়া পরা এ কোন সন্ন্যাসী। দত্তবাড়ি বিদায় ব্যাথায় মুহ্যমান। বাইরে ভলান্টিয়াররা জয়ধ্বনি দিচ্ছে। ঘরছাড়া সন্ন্যাসীর ডাক আলমের রক্তে। একটা নিরুদ্দেশ্য আহ্বানে আলমের বাউল মন ব্যথায় টন টন করতে লাগল। হায় হায় আমি একা পড়ে রইলাম। সবাই চলে গেল।

হঠাৎ কার স্পর্শ আলমের সম্বিৎ ফিরে এল। ফিরে দেখে স্বয়ং গুরু হাবু দত্ত। তার কাঁধে হাত রেখে বললে "কি-রে আলম যে, তুই এখানে ? কবে এলি ?'

আলম কোন কথাই বলতে পারল না তার চোখ ছল ছল করছে। হাবু দত্ত বললেন, "ও আমার ছোট ভাই, নরেন, স্বামী বিবেকানন্দ।"

আলম ঐখানেই গুরুর পায়ে পড়ে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলল, "আমি কিছুই শিখতে পারলাম না। ঘর থেকে এক পা বেরুলেই মন কেবল ঘরের দিকে টানে। শেখার দিকে মন কৈ ?"

হাবু দত্ত অনেক বলে কয়ে ছেলেটাকে বুঝ মানান। আলম তুই যা শিখেছিস, তারপরে আমি আর তোকে কি শেখাব। তোর মত আর একটি ক্লেরিওনেট বাজানোওয়ালা দেখা দেখিনি কোলকাতায়।—তাছাড়া, আমার বুকের যা অবস্থা।' হাবু দত্ত হতাশ ভাবে মাথা নাড়ল। আলম এবার গুরুর মুখের দিকে চেয়ে দেখলে, তিনি যেন আরো শীর্ণ হয়ে গেছন, মুখটা শুকনো শুকনো, চোখ ছুটো জ্বল জ্বল করছে।

আলমের বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠল, তার শেখা কি তবে শেষ হয়ে গেল? ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না আলম। তার গুরুর হাঁপানির রোগ ছিল, তবে কি এবার বুকের দোষ হল? কেমন যেন এইটুকু কথা বলতে গিয়েই হাঁপিয়ে যাচ্ছেন। আলমের কাঁধে ভর দিয়েই তিনি তাঁর ঘরে ঢুকে বিছানায় চোখ বন্ধ করে শুয়ে পড়লেন। আলম ধীরে ধীরে তার পা টিপে দিতে লাগল। তাঁর শয্যার পাশে পর পর সাজান রয়েছে নানা জাতের বাঁশী। দেশী বিদেশী। ঐ এক একটা বাঁশীর এক এক রকমের সুর। আলম চোখ দিয়ে যেন ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেল সেই বাঁশীগুলি। একটা অব্যক্ত বিচিত্র সুর-লহরী যেন ভেসে উঠতে লাগল ঐ যন্ত্রগুলি থেকে। গুরুদেবের গাঢ় নিশ্বাস-প্রশ্বাসের ধ্বনি তলিয়ে গেল। আলম যেন কোথায় হারিয়ে গেল। কোন্ সুদূর-সাগরে।

ধীরে ধীরে মহলা থেকে বেরিয়ে এল আলম—নিরস, বিষণ্ণ, করুণ।

॥ সাত ॥

সেদিন আলমের নিরম্বু উপবাস। লঙ্গরখানায় গিয়ে যে খাবে তাও গা করল না। মনটা কেমন ভোঁতা হয়ে গেছে। উদাসীন। হাঁটতে হাঁটতে গঙ্গার ধারে জেটির পাশে একটা ছাতিম গাছের নীচে গা এলিয়ে দিল। জেটির গায়ে ছোট ছোট ঢেউগুলি ধাক্কা খেয়ে ঝির ঝির শব্দ তুলে বয়ে যাচ্ছে। উদাস নয়নে সেই দিকে চেয়ে জলের খেলা দেখতে দেখতে আলম কোথায় যেন তলিয়ে গেল।

আহা! মায়ের নামটি বড় মিষ্টি, সুন্দরী! কিন্তু মনটা বড় কড়া। তবে তিনিই বা ক'দিক সামলাবেন! সহানুভূতিতে আলমের মনটা গলে যায়।

পাড়ার ছোঁড়াগুলোও হয়েছে তেমনি! সকালে বিকেলে খেলতে হলেই চলে যাবে ঐ বুড়ো শিবতলায়। যেন ও ছাড়া আর খেলবার জায়গা নেই। পাড়ার লোকে বলে ও শিব বড় জাগ্রত দেবতা। ঐ শিবের নামেই এ গাঁয়ের নাম হয়েছে শিবপুর।

গাঁয়ের হিন্দু মুসলমান তাদের বাগানের প্রথম তরি তরকারি, নতুন গাইয়ের দুধ আগে ভেট দেবে ঐ বুড়ো শিবকে। পাড়ার লোকে বলে ঐ সব ছোট ছোট ছেলেদের সঙ্গে শিবও নাকি খেলা করেন। মা কাকে কি বলবেন! কিন্তু সকাল নয়, বিকেল নয়, আলম যে পাঠশালা ফাঁকি দিয়ে দুপুর বেলাটাও লুকিয়ে কাটায় ওখানে, তা কে জানত?

এ খোঁজ বেরুলো হঠাৎ। আজ দুপুরেই এ পথে যেতে পণ্ডিত মশাই এসেছিলেন আলমদের বাড়ি, আলমের খোঁজ করতে। ও কেন যাচ্ছে না পাঠশালায়?

মা শুনেতো অবাক! ঘোমটা টেনে দেউড়ির পাশে এসে দাঁড়িয়ে বললেন, "সে কি? আমিতো ওকে রোজ পাঠাই।"

পণ্ডিত মশাই তাঁর পাকা মাথাটা নেড়ে বললেন, "কিন্তু ও যা যায় না। দেখ খোঁজ নিয়ে কোথায় কি করে!

এই খোঁজ পড়ল। খোঁজ! খোঁজ! মা ব্যাকুল হয়ে চারদিকে লোক পাঠালেন। এ গেল এদিকে, ও গেল ওদিকে। সদু খাঁ খুঁজতে খুঁজতে গিয়ে দেখলেন বুড়ো শিবতলার মন্দিরে এক মস্ত জটাধারী সাধু সেতার বাজাচ্ছেন আর তাঁর ঐ আট বছরের মাথাবড় ক্ষুদে ছেলেটা খুব মাথা নেড়ে সঙ্গে তবলায় ঠেকা দিচ্ছে।

ওকে কেউ শেখায়নি। সদু খাঁ তাঁর মেজো ছেলে আফতাব উদ্দিনকে তবলা আর বেহালা শেখাবার জন্য রামকানাই শীল আর রামধন শীল—এই দুই ওস্তাদ রেখে দিয়েছিলেন। রামকানাই তবলা বাজান, রামধন বেহালা। এই ক্ষুদে ছেলেটা তাঁদের বাজনা শুনে শুনেই যা শিখেছে।

সদু খাঁ ছেলের নির্ভুল বাজনা শুনে মনে মনে অবাক হয়ে গেলেন, খুশি ও হলেন। ছেলেকে ধরে নিয়ে যাওয়া তাঁর আর হল না। তিনি যেমন এসেছিলেন তেমনি নিঃশব্দে বাড়ি ফিরে ছেলের মাকে খুশি-মন নিয়ে বলতে গেলেন, "ওকে কিছু বলো না। ঐটুকু ছেলে তবলা বাজাচ্ছে এক মহাত্মা সাধুর সঙ্গে। কেউ ওকে শেখায়নি। এক এ মস্ত কথা।"

এতে মা উঠলেন আরো রেগে। বললেন, "যেমন বাবা, তাঁর তেমনি ছেলে। তোমারতো আর খোঁজ রাখতে হয় না কত ধানে কত চাল হয়।"

"এ পাপের সম্পত্তি আমি চাই না" বলেই সন্তু খাঁ চুপ করে গেলেন। মা ঝঙ্কার দিয়ে বললেন, তুমিই ছেলেগুলির মাথা খাচ্ছো।"

বিকেলে আর আর পড়ুয়াদের সঙ্গে রোজকার মত আজো আলম বাড়ির উঠোনে পা দিতেই মা ছেলের দু'হাত ধরে ঠাস ঠাস করে দুগালে বসিয়ে দিলেন দু'চড়। বললেন, "হতভাগা! এই বয়সেই পাঠশালা পালিয়ে ঐ সাধু সন্তদের আড্ডায় গিয়ে ভিড়েছিস? সারাদিন ওখানে করিস কি?"

মা-র ঐ রাগতঃ মূর্ত্তি দেখে আলাম ভয়ে ভয়ে সত্যি কথাই বলে ফেল্লে, "সিদ্ধি ঘুটে দিই, গাঁজা টিপে দিই।"

"হায় আল্লা।" শুনে মা-র কেঁদে ফেলতে ইচ্ছে হল। চিৎকার করে বললেন, বড় হলে ডাকাত হবি? ডাকাত হবার ইচ্ছা? বল? বল?"

ছেলেটা তখন কাঁদো কাঁদো হয়ে বললে, "পাঠশালায় খালি খালি পড়তে বলে! আমার ভাল লাগে না যে—"

মা বললেন, "কি ভালল্াগে শুনি? ঐ বাউণ্ডুলে ডাকাতদের আড্ডা?"

ছেলেটা মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, হ্যাঁ—, ওরা যে কত সুন্দর সুন্দর গান গায়, সেতার বাজায়, আমিতো তাই সারাদিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনি।"

এ বংশের আর এক রোগ হল এই গান বাজনা। ছেলের বাপের ও সেই দশা। গান বাজনা পেলে আর কোনো দিকে কোন ভ্রূক্ষেপই নেই। গান বাজনা ছাড়া সংসারের আর কোন কথাটাইবা উনি

জানেন বা বোঝেন। এই গান বাজনা করে উনিও সারাজীবন কম জ্বালাননি আলমের মা-কে।

ক্ষেতের সেরা চাল, বাড়ীর টাটকা ঘি, বড় মুরগীটি, সেরা খাসিটি, সব নিয়ে ভেট দিয়ে আসতেন বিশ বাইশ মাইল দূরে সেই ত্রিপুরার রাজদরবারের ওস্তাদ কাশেম আলি খাঁকে। কেন? না, তিনি নাকি খুব ভাল রবাব বাজান। মিঞা তানসেনের মেয়ের দিকের বংশধরের আত্মীয়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কয়েক দণ্ড তাঁর বাজনা শোনার জন্যেই নাকি চাই অতসব ভেট।

তাও ছিল যেমন তেমন। একদিন নাকি সেই কাশেম আলি বললেন, "তুমি এতদূর থেকে এত সব জিনিস নিয়ে আস?"

সদু খাঁ নাকি তখন বলেছিলেন, "হ্যাঁ খাঁ সাহেব। আপনার বাজনা শুনে আমি পাগল হয়ে যাই।"

শুনে ওস্তাদ বললেন, "তোমার এত আগ্রহ! তুমি নিজে কিছু বাজনা শেখনা কেন? পেশাদার না হওতো আমি তোমাকে শেখাব।"

সদু খাঁ দু'হাত সামনে বাড়িয়ে বললেন, "আমার বয়স হয়ে গেছে। এখন কি হবে ও সব?"

ওস্তাদ বললেন, "আলবৎ হবে। তুমি সেতার শেখ। আমি তোমাকে সেতার শেখাব।"

সেই থেকে সদু খাঁর ধ্যান জ্ঞান হয়েছে ঐ সেতার। আলমের বড় ভাইটিও সেতার নিয়ে আছে। এই ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলেরাও যদি লেখা পড়া ছেড়ে এখন থেকেই সেতার টিং টিং করা নিয়ে মেতে ওঠে তবে এই গেরস্ত সংসারের গতি হবে কী? আলম যখন মায়ের

কোলে, তখন থেকেই বাপের সেতারের তালে তালে সে মায়ের বুকে ঠেকা দিয়েছে, আর কি খুশি। কিন্তু এই কচি কাঁচার উপায় হবে কী? একা আর ক'দিক তিনি সামলাবেন? নাঃ, ছেলেদের এখন থেকে কড়া শাসনে রাখতে হবে। পাঠশালা-পালানো অপরাধী ছেলেটার হাত-পা বেঁধে ঢেঁকি ঘরে রাখলেন আটকে। "তোমার আজকে খাওয়া বন্ধ।"

আলম কি জেগে স্বপ্ন দেখছিল। জলের ছোট ছোট ফেনাগুলি যেন তার চোখের ওপর ভাসছে। সে ধড়ফড়িয়ে উঠে বসল। পেটের মধ্যে চোঁ চোঁ করছিল খিদেয়। নিমেষে সে কথা মুছে গেল তার মন থেকে। মনের মধ্যে হঠাৎ যেন একটা আলো দপ করে জ্বলে উঠল। সে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। অনেক অনেক প্রতীক্ষার পর অন্ধকারে আলো দেখতে পেয়েছে সে। ক্লেরিয়নেট ও বেহালাটাকে আঁকড়ে ধরল বুকের কাছে। উত্তেজনায় খিদের কথা আর তার মনেই এল না। সে সোজা পূব মুখো হাঁটা দিল। আর এদিক ওদিক নয়। সোজা [illegible] স্টেশন।

।। আট ।।

আবার সেই রেল, আবার সেই ষ্টিমার, আবার হাঁটা পথ, আবার সেই খাল বিল মাঠ। সবুজ ঘেরা সেই দিগন্ত। আমের বোলের গন্ধ। বকুল গাছের পাশ দিয়ে যেতে মৌমাছিদের ভনভনানি। আবার সেই নরম মাটি। বাতাসে ধুলোর সোঁদা গন্ধ। হাওয়া ওঠে শিরশিরিয়ে শিরশিরিয়ে। উদাল গায়ে মাটিতে গড়াগড়ি দিতে ইচ্ছে হয়। আবার সেই পূর্ব্ববঙ্গ মা-টি মা, মাগো!

আলম যখন যা ভাবে তার শেষ না দেখে যেন তার নিস্তার নেই। লক্ষ্য যখন স্থির, উপায়ের জন্যে জান কবুল। ঘাড়ে যেন জীন চেপে বসে। সেই যেন তাকে চালিয়ে নিয়ে ফেরে। কোথা দিয়ে কি ভাবে লক্ষ্যে এসে পৌঁছায় তা ধীরে সুস্থে পরে ভেবে দেখতে গেলে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়তে হয়। পথের বাধা ওর কাছে কিছুই নয়। যখন চলে কিছুই ঠাওর করে না। দিগ্‌বিদিক জ্ঞান থাকে না। লক্ষ্যের দিকে স্থির দৃষ্টি রেখে বেপরোয়া এগিয়ে চলে—তাতে মরুক-বাঁচুক ভ্রূক্ষেপ নেই। সে যেন হঠাৎ নিজেকে আবিষ্কার করল, পূর্ববাঙলার সোঁদা মাটির মধ্যে। ময়মনসিংহ শহর, তার থেকে দশ মাইল পশ্চিমে—মুক্তাগাছা।

আলম এই যে প্রায় দু'শ মাইল পথ অতিক্রম করে এল তাতে তার পায়ের তলায় ফোসকা পড়ে ফেটে রক্ত বেরুলেও গতি একদিনের তরেও শ্লথ হয়নি তার। চলছে তো চলছেই। পথে পথে গাঁয়ের লোক শুধিয়েছে, "কোথেকে আসা হল", "কৈ যাওয়া হয় গো", "কার বাড়ি"। আলম সংক্ষেপে জবাব সেরেছে "রাজা জগৎকিশোরের বাড়ি"। পাছে কথায় বার্তায় পথ চলায় দেরী

হয়। তাঁর মনের মধ্যে উত্তেজনা তখন টগবগিয়ে ফুটছে। গাঁয়ের লোক 'থ' হয়ে গেছে,—বলে কি? অবাক হয়ে দেখছে এই মাথা বড় ছেলেটাকে। পাগল না মাথা খারাপ। তড়বড়িয়ে চলেছে ধানকাটা রিক্ত মাঠের মধ্যে দিয়ে, কখনো বা ছোট ছোট নীল ফুল ফোটা খেসারি খেতের পাস দিয়ে।

রাজা জগৎকিশোরের বাড়ির সামনে এসে আলমের গতি সত্যি সত্যিই একেবারে থেমে গেল। যত রাজ্যের শব্দ যেন এখানে এসে থেমে গেছে। আলম 'থ' মেরে দাঁড়িয়ে রইল। একটা হাতি থপ থপ করে পাশ দিয়ে চলে গেল। যেন একটা পর্বত-বিশেষ। পাঁচ পাঁচটা হাতি বাঁধা রয়েছে এক পাশে। লোকজন চাকর বাকর সব যাচ্ছে আসছে নিঃশব্দে। কেবল হাতির গলার ঘণ্টা বাজছে ঠং-ঠং, ঠং-ঠং ঠং-ঠং।

আলম এক পা এক পা করে "এগিয়ে যাচ্ছে। সামনেই দুটো প্রকাণ্ড ডোরা কাটা বাঘ। গেটের দু'দিকে দুটো দাঁড়িয়ে আছে। আলমের বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল। এদিক ওদিক তাকাল। আলমের মনে হল যেন গোটা বাড়িটাই ঐ বাঘের মত ঘাপটি মেরে আছে। যে কোন মুহূর্ত্তে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। তারপর ছিঁড়ে-খুড়ে কোথায় মিলিয়ে দেবে কেউ জানতেও পারবে না।

হঠাৎ আলম হক-চকিয়ে উঠল। কে যেন তার কানের কাছে হিস্ হিস্ করে বলল, এই হতভাগা, এখানে কেন মরতে এসেছিস।"

আলমের মুখে স্বর বেরোয় না। ও কিছু বলার আগেই আর একটা ভারী স্বর ভেসে এল, "ও ছোঁড়ার হাতে ওটা কিরে—কি চায় ও?"

'হায় আল্লা!" বেহালাটাই হয়ত আলমকে বাঁচাল। না সেইটাই কাল হল। লোকটা আলমের পিঠে নিঃশব্দে গুঁতো মেরে আবার হিস্ হিস্ করে বলল, "তোর হাতে এটা কি? আলম যেন চোখে অন্ধকার দেখতে লাগল। আবার সেই ভারী স্বর ভেসে এল, "কি চায় ও!"

আলম এই প্রথম দেখল তার দক্ষিণে এক বাঁধানো ঘাট পুকুর। হঠাৎই যেন সেটা মাটি ফুঁড়ে দেখা দিল। ঘাটের কাছে পদ্মফুল ফুটে আছে, সুন্দর বাগিচা ঘেরা। এই পড়ন্ত বেলায় যেন একটা সুন্দর গন্ধ ভেসে এল। সবটাই যেন স্বপ্নের মত। লোকটা আবার আলমকে গোপনে পিঠে গুঁতো মেরে হিস্ হিস্ করল, "কু-মতলব থাকলে জ্যান্ত কবর।" ঠেলে পুকুর ঘাটের দিকে নিয়ে গেল।

স্বাস্থ্যবান, শ্যামবর্ণ মাজা রং, মুখে পাতলা দাড়ি, গায়ে ফোতুয়া মধ্যবয়সী লোকটি পুকুর ঘাটলায় ছোট পুরু গালিচার ওপর বসে একটু হেলান দিয়ে আলমের মুখের দিকে চেয়ে আছে। আলমের মুখে কথা নেই। অথচ এই দিনটার জন্যে আলম কত ভাবেই না ভেবে রেখেছিল। রাজা যদি এই বলে তবে আমি বলব এই, উনি যদি তাই বলে তবে আমি বলব সেই, কিন্তু এখন—আলমের পায়ে পায়ে ঠক ঠক করে ঠোকা লাগছে।

সেই দেড়েল লোকটার সামনে যে দু'জন লোক বসে আছে তারাও চেয়ে আছে আলমের মুখের দিকে। তাদের চোখ চারটে দিয়ে যেন তীব্র ঘৃণা ঠিকরে পড়ছে। তার মধ্যে থেকে একজন ঘৃণা-মিশ্রিত স্বরে বলল, "কিরে কর্তার কথা কানে ঢুকেছে—হাতে ওটা কি?" ওদের ভাবখানা—আলম যেন কিছু চুরি করতে এসেছে, অথবা ঠকিয়ে কিছু নিয়ে যাবে। কিন্তু কর্তা তেমনি শান্ত ভাবেই

চেয়ে আছে আলমের মুখের দিকে। আলমের মনে মনে সাজানো কোন কথাই মুখে এল না, কাঁপতে কাঁপতে শুধু বলতে পারল, "আমি ওস্তাদ . নাম আলম আলাউদ্দিন খাঁ পিতার নাম সদু খাঁ নিবাস শিবপুর "

কর্তা তেমনি ভাবেই চেয়ে আছে আলমের দিকে। তার মুখের দিকে চেয়ে তার ভাববৈকল্য কিছুই বোঝা যায় না। মোসাহেবের চোখে মুখে ব্যঙ্গ-কৌতুক। আলমের গলায় ঘড় ঘড় করছে, "কলকাতায় আমার সমতুল কেউ "

আলম কথা শেষ করতে পারল না, তার গলা বুজে গেল। অসহায়ভাবে চেয়ে রইল কর্তার মুখের দিকে। যে লোকটা আলমকে ধরে রেখেছিল সে কর্তার ইঙ্গিতে আলমকে ছেড়ে দিয়ে সসম্ভ্রমে দাঁড়াল।

"তুমি কলকাতা থেকে এসেছ?" —কর্তা শুধালেন। আলম জবাবে শুধু মাথা নাড়তে পারল কর্তা বললেন, ওর থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করে দে। কাল বাজনা শুনব। যাও ওর সঙ্গে।

এই চাপা উত্তেজনা, এই দৌড় ঝাঁপ সবকিছু যেন এক কথাতে বিলীন হয়ে গেল। এত ভাবনা চিন্তার ব্যাপারটা এত সহজে মিটে গেল!—বিশ্বাস হয় না। আলম যেন বুঝতেই পারল না কর্তার কথা। ঠাট্টা নয়ত? মুহূর্তে বুকটা একেবারে খালি হয়ে গেল। সঙ্গের লোকটা ওকে আবার গুঁতো দিয়ে ওর সম্বিৎ ফিরিয়ে এনে ইঙ্গিতে যেতে বলল। না, সবই সত্যি। সে রাজদরবারের ওস্তাদ। কৃতজ্ঞতায় আলমের মনটা গলে গেল। ইচ্ছে হল লুটিয়ে পড়ে কর্তার পায়ের ধুলো নেয়। কিন্তু পাশের যমদূতের ঠেলায় ওকে এগিয়ে যেতে হল অতিথিশালার দিকে। যেতে যেতে আলম হাতের ডান দিকে

একেবারে হাতের কাছেই সেই ভীষণাকৃতি বাঘ দুটোকে দেখে আঁতকে উঠল। হাঁ করে দাঁত বের করে আছে। চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। একটা পা সামনের দিকে বাড়ান। পর মুহূর্তেই আলমের ভুল ভাঙল। ও দুটো কাগুজে বাঘ। ভেতরে কাগজ পোরা। সাহস ফিরে এল। তড়বড় করে যমদূতের সঙ্গে এগিয়ে চলল আলম।

॥ নয় ॥

জগতকিশোরের অতিথিশালায় শুয়ে সারারাত ধরে কি সব এলোপাথারি স্বপ্ন দেখছে আলম।

এ স্বপ্নের শেষ নেই, এ তৃষ্ণার নেই শান্তি—আশ মেটে না। আলম তলিয়ে গেল আর এক সুরে। স্বরগুলি যেন একের পর এক ভেসে আসছে কোন ধূসর সুদূর থেকে। স্মৃতির অতলে কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছিল এরা। মাঝখানে আট-দশ বছরের ব্যবধান। পাথুরিয়াঘাটার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়িতে নুলো গোপালের সামনে বসে আট বছরের বালক তানপুরার সঙ্গে গলা মিলিয়ে শুধু সারগামাপাধানি করে গেছে আটটি বছর। স্বরগুলি গেঁথে গিয়েছিল মনের মণিকোঠায়। নুলো গোপাল প্লেগে মারা গেলেন, আলমের সুরের জগতে যেন বইতে লাগল এলোমেলো হাওয়া। কখনো বাঁশী, কখনো বেহালা, কখনো সানাই, কখনো তবলা—আলমের সুরের

রাজ্যে যেন ধুন্দুমার লেগে গেল। হাতের সামনে যা পেল তাই যেন গোগ্রাসে গিলতে লাগল। ইহুঁবঙ্গ, যাত্রা, অপেরা—কোলকাতার বাজারে যে সুর কানে এল তাই জিনে নিল আলম। তারপরে? আর শেখার বাকি রইল কি?—আমি ওস্তাদ, ওস্তাদজী। মহারাজ আমি ওস্তাদ হয়ে আইছি। আমার সমতুল এই বাংলাদেশে কেন, ভূভারতে নাই। লোবো সাহেবের ইংরেজি ব্যাণ্ডের সুর, কি আলিবাবার সেই—'এত্তা বড়া বাড়িমে এত্তা জঞ্জাল'-এর সুরতো আলমের নখদর্পণে। কিন্তু একি হল? কোথা দিয়ে কি হয়ে যাচ্ছে?

এক একটি টোকায় সতঃউৎসাবিত সুরের ফল্গুধারায় সব ধুয়ে মুছে সুবের জঞ্জাল যেন সাফ করে দিচ্ছে। এ সুব যেন স্বপ্নলোক থেকে ভেসে আসছে আলমেব অবচেতনায়। আহা! একি কোমল বে'। না না, এযে 'সা'-এব অঙ্গাঙ্গী হয়ে আছে 'সা'-এর স্পর্শে স্পর্শাতুব কোমলতায় যেন কাঁপছে। সাখারি 'বে'। ওঃ আল্লা। এ সুর কোথা থেকে এল। ঐ আমাকে কি শোনাল।

টৌড়ী রাগেব কোমল বিধুব উদাসী লাস্য মোচড় দিযে উঠতে লাগল আলমের বুকে। আঝোরে ধাবা বইতে লাগল ওব দু'চোখ বেয়ে। ও কিছুতেই নিজেকে সামলাতে পাবছে না। সব কিছু যেন ওর শেষ হয়ে গেছে। সব দম্ভ ধুলায মিশেছে। হায! হায! এতদিন আমি কি শিখলাম। কি করলাম। আলমেব কান্না আর থামে না। সকালে সেই যমদূতের সঙ্গে যখন আলম রাজদরবারে এল তখনও চোখের জলে সব ঝাপসা।

সেই ঝাপসা জলে কালকের ঘাটলা বসা সাধারণ মানুষটি যেন পর্ব্বতপ্রমাণ হয়ে উঠল আলমের চোখে। রাজা জগৎকিশোর রায়-চৌধুরী যার সামনে বাঘে গরুতে একসঙ্গে জল খায়। হাতি বাঘ

শিকারে যার ভারত-জোড়া নাম। দেশ-বিদেশের পালোয়ানরা যার শক্তিকে সেলাম ঠোকে। আলম দরবারে উপস্থিত কারো দিকে লক্ষ্য করল না। দরবারের কোন নিয়মকানুনও মানল না। জগৎকিশোর কিছু বলার আগেই আলম রাজার দু'পা ধরে কেঁদে লুটিয়ে পড়ল। "আমাকে মেরে ফেলার হুকুম করুন মহারাজ। আমি ঝুট বলেছি। আমি সঙ্গীতের কিছুই জানি না। থিয়েটারের কুসঙ্গে পড়েছিলাম," আলম ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলতে লাগল, "আজ সকালে যে বাজনা শুনলাম, তার গোলামের গোলাম হবারও যুগ্যি নই আমি।"

রাজা বিব্রত হয়ে পড়লেন, কিন্তু ছেলেটার আবেগ বিহ্বল কাতরতা সম্বন্ধে ঠিক সন্দেহ করতে পারলেন না। উনি সপ্রশ্নদৃষ্টিতে তাকালেন দরবারের ওস্তাদ রামপুরের আহম্মদ আলি খাঁর দিকে। আহাম্মদ আলি সেলাম করে বললেন, 'হাঁ মহারাজ, আজ সুবামে আমি তোড়ী রেয়াজ করেছি।"

রাজা ছেলেটার এই পাগলামিতে একটা স্নেহমিশ্রিত কৌতুক অনুভব করতে লাগলেন। এর মধ্যে যেন একটা মজাও আছে। সভাসুদ্ধ সবাই ভাবছে এই মিথ্যাবাদী ঠগ ছোঁড়াটাকে লাথি মেরে দেয় হাঁকিয়ে। কর্তার সামনে মিথ্যে বলা।

"কান্না থামা। তুই এখানে কেন এসেছিস, কি চাস বল।" রাজা বললেন।

আলম বিগলিত ধারায় মহম্মদ আলিকে দেখিয়ে করজোড়ে বলল, "মহারাজ. আমি ওনার গোলাম হতে চাই।"

আলমের দেহমনের এমন সরল অভিব্যক্তিতে রাজা জগৎকিশোর অভিভূতিকইছুটা হয়ে পড়লেন। এমন আবেদন এর আগে কেউ

কোন দিনও করেনি। সহানুভূতির সঙ্গে তাকালেন ওস্তাদের দিকে। আহাম্মদ আলি মহারাজের মনোবাসনা বুঝে তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, "মহারাজ যদি চান। আমার আপত্তি নেই।"

আলম কান্নার আবেগে তখনো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে উঠছে। জগৎ কিশোর ঐ যমদূতের দিকে চেয়ে বললেন, "এই ছেলেটা এখন থেকে ওস্তাদজীর সঙ্গেই থাকবে। ওর খাবারের বন্দোবস্ত যেন ঠিকমত যায়।"

আলম কৃতজ্ঞতা জানাতেও ভুলে গেল। যমদূত এসে নিয়ে গেল সভা থেকে। যাবার পথে পিঠে আবার অলক্ষ্যে গুঁতো দিয়ে বলল, এই ছোঁড়া, কর্তাকে যাদু-ফাদু করস নাই তো। জোরের

॥ দশ ॥

ওস্তাদ দুপুরে দরবার থেকে ঘরে ফিরে দেখলেন বদনায় জল, পাশে খড়ম রেখে গামছা হাতে আলম দাঁড়িয়ে আছে দোরের পাশে ওস্তাদের অপেক্ষায়। ওস্তাদ ছেলেটার আপাদ-মস্তক দেখে জুতো খুলে হাত-মুখ ধুয়ে নিলে আলম গামছা এগিয়ে ধরল। ওস্তাদের হাতমুখ মোছা হতেই আলম আবার গামছাটা নিয়ে খড়মজোড়া এগিয়ে দিল। ওস্তাদ খড়ম পায়ে দিতেই আলম জুতোজোড়া হাতে তুলে নিয়ে মাথা নীচু করে বিনীত ভাবে সেখানে যা রাখার রাখতে লাগল। কারও মুখে কোন কথা নেই। ওস্তাদ শয্যায় গা এলিয়ে দিতেই

আলম পাখা নিয়ে হাওয়া করতে সুরু করল। ওস্তাদ চোখের আড়ে একবার দেখে নিয়ে চোখ বন্ধ করে সারঙ্গ রাগে গুন-গুন করতে লাগল। মিনিট পনেরো কাটলো ঐ ভাবে। ওস্তাদ ভাবতেও পারলেন না আলম এক সময় ওস্তাদের কণ্ঠের সমস্ত কাজ সমস্ত খাঁচ খোঁচ হুবহু তুলে নিয়েছে মনের বীণার তারে। ওস্তাদ আরাম করে অর্দ্ধনিমীলিত চোখে বললেন, "খানা!"

আলম তড়াক্ করে পাখা রেখে মেঝেতে মাদুর বিছিয়ে রসুইখানা থেকে দফে দফে ওস্তাদের খানা এনে রাখতে লাগলো। ওস্তাদের মুখে কথা নেই, ঐ ভাবে গুন-গুন করতে করতে ধীরে সুস্থে উঠে মাদুরে বসলেন। আলম আবার পাখা নিয়ে দাঁড়ালো। পাখার হাওয়ায় ওস্তাদ খেতে খেতে ভাবলেন—এ লেড়কা ভবিষৎ জানে, আমার মত ওস্তাদকে এই ভাবেই খিদমৎ করতে হয়। এই ভেবে আলমের এই সেবার জন্য কোন উচ্চবাচ্য করলেন না, গোস্তে রুটি ভিজিয়ে মুখে পুরে দিয়ে দেখলেন রুটিটি বেশ নরম পুচ্ পুচে—মুখে দিতেই মিলিয়ে যাচ্ছে। তৃপ্তির শ্বাস চেপে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। ওঃ কতদিন ঘর-দোর ছাড়া। বিবির হাতে পাকানো খানার স্বাদ আর যেন মনেই পড়ে না।

সেইদিন থেকে আলমের সুরু হল নিরবিচ্ছিন্ন গুরু সেবার পর্ব্ব। পান খেয়ে গুরুর মুখে রস জমলে পিকদানী এগিয়ে ধরা, দিবানিদ্রার আগে গুরুর পদসেবা করা। গুরুর খাবার রুটির আটা জলে ভিজিয়ে ঘণ্টাভর দলাই-মালাই করে রুটি পাকান, ওস্তাদ যখন দরবারে চলেন—আলম যায় সরোদ ঘাড়ে করে পেছনে পেছনে। ব্যাস আলমের বাজনা শেখা ঐ পর্যন্ত। ঐ পর্যন্তই সে সরোদ ছুঁতে পায়। আলম যখন সরোদটা মোছে তখন গুরু ঘাড় কাত করে লক্ষ্য রাখে সারোদের তারে একটু টোকাও যেন না লাগে। আলমের কিন্তু

ক্লান্তি নেই। কিসের আশে ছেলেটা এই ভাবে পড়ে আছে—ওস্তাদ অত তলিয়ে দেখলেন না, কিন্তু ক্রমে ক্রমে ওস্তাদ এমন অবস্থায় পৌঁছলেন যে হাতের কাছে আলম না থাকলে তিনি অচল। পায়ের কাছে জুতো না দেখলে তাকাতে হয় আলমের দিকে। একেবারে পুরোপুরি আলম নির্ভর।

মাঝে মাঝেই রাজা জগৎকিশোর যান শিকারে। শিকারী হিসেবে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে তাঁর নাম ডাক। কখনো আসাম, কখনো উত্তর প্রদেশ কখনো বা দক্ষিণের জঙ্গলে তাঁর অভিযান চলে। সদলবলে রাজা যান শিকারে। সেবার ওস্তাদ আহম্মদ আলি খাঁকেও যেতে হল রাজার সঙ্গে। তাঁবু পড়েছে গারো পাহাড়ের কোন জঙ্গলে। আলম রয়ে গেল ওস্তাদের ঘর-সামান পাহারা দেবার জন্যে। গেল পনেরো ষোল দিন। তারপরে রাজা একদিন ফিরলেন সদলবলে ধূমধাম করে, বাজি পুড়িয়ে। সঙ্গে প্রকাণ্ড দু'টি দাঁতাল হাতির মাথা। রাজবাড়িতে হৈচৈ পড়ে গেল। আশে পাশের দশ গাঁয়ের লোক ভীড় করে এল হাতির মাথা দেখতে। 'ধন্য-ধন্য' করতে লাগল রাজার। চারিদিকে ছেলে বুড়োর চিৎকার চেঁচামেচি। রাজবাড়ির চত্বরে ঢুকেই ওস্তাদের কাণ খাড়া হয়ে উঠল। পাকা কান। তাঁর ঘরে সরোদ কে বাজায়? এ কার সুর? চঞ্চল হয়ে উঠলেন ওস্তাদ, উত্তেজনায় কাঁপতে লাগলেন। প্রায় দিক-বিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে ছুটে গেলেন তাঁর ঘরের দিকে। ছেলেটার কিন্তু কে এল—কে গেল, চারদিকের এই হৈ-হট্টগোল কোন কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নেই। ওস্তাদ চলে যাবার পর কেউ ওকে বাইরে দেখেনি। কখন রেঁধেছে, কখন স্নান করেছে ওই জানে। রাজাবাহাদুর না থাকাতে রাজবাড়ীর সবই চলেছে ঢিলা-ঢালা। কেউ কারও খোঁজ রাখেনি। আলম সবার চোখ এড়িয়ে গিয়েছে। কিন্তু ওস্তাদের কানকে ফাঁকি দেবে কি করে। দরজায় দুম-দুম করে কিল পড়তে লাগলো।

॥ এগার ॥

আলমের আবার যাত্রা হল সুরু। এবার আলমের ইচ্ছা অনিচ্ছা বলে কিছু নেই। কোথায় যাবে, কোথায় থাকবে, কি খাবে, কোন কিছুরই ভাবনা নেই। ওরা প্রথম এসে উঠল ঘুঘুডাঙ্গার ছুলিচাঁদবাবুর বাড়ি। ছুলিচাঁদবাবু রসিক লোক। ভারতের বহু জ্ঞানী গুণী গাইয়ে বাজিয়ে তাঁর বাড়িতে আশ্রয় পেয়েছেন। গণপৎ রাও, বাদল খাঁ, তারাবাঈয়ের মত গুণীরা সব। আহাম্মদ আলি আর তার এই চেলাটিকে বেশ আদর আপ্যায়ন করেই রাখলেন ছুলিচাঁদবাবু। বেশ আরামে দু'মাস কেটে গেল ওখানে। সেখান থেকে পাটনার নবাব বাড়িতে একমাস। তারপর পথে কাশীতে কাটল দু'মাস। এ সব ক্ষেত্রে যেমন খাওয়া দাওয়ার তোয়াজ তেমনি ওস্তাদের দু'পয়সা আসতেও লাগল। প্রাপ্তিযোগ বুঝে ওস্তাদ এখানে ওখানে থেমে এগিয়ে চললেন।

বিদায়! বিদায়! আলমের মনে আনন্দও নেই, দুঃখও নেই। নিয়তির অমোঘটানে যেন ভেসে চলেছে। ঘটনার এই গতি-প্রকৃতিতে তার কোন হাত নেই। শুধুই ভেসে চলা। চেষ্টা করলেও এর কোন নড়চড় নেই। আলম অবশ্য চেষ্টাও কিছু করল না। বন-বাদাড় গাছ-পালা আলমের কাছে কোনটাই অপরিচিত নয়। সে ভেসে চলেছে। কিন্তু এবার সামনে রুক্ষ মাটির ঝড়। লাল পাথুরে মাটিতে চোখে ধাঁধা লাগে। খেলার পাহাড়গুলি যেন চলেছে সঙ্গে সঙ্গে। মাঝে মধ্যে নালানদী, লাল মাটি গোলা, ঘোলাটে।

আলামের নিজের যেন কোন সত্বা নেই। সে চলেছে ওস্তাদের পিছু পিছু, তার তলপি বহন করে। বাতাসে আগুনের হল্‌কা।

যেন ঝল্‌সে ছাল ছাড়িয়ে নেবে। আলমের শরীর কালো ছ্যাঁকা পোড়া হয়ে গেল। এ বাংলা দেশের গুমোট ভ্যাপসা গরম নয়। আগুনের হল্‌কায় চিড়্‌বিড়্‌ করে চামড়া পোড়ে।

পল্‌কা স্বাস্থ্যের আলম উত্তর ভারতে—রামপুরে ওস্তাদের বাড়ি পৌঁছতে পৌঁছতে অসুস্থ হয়ে পড়ল। তার বড় মাথাটা যেন ধড় থেকে খসে পড়বে। পল্‌কা দেহটা যেন মাথাটাকে আর বইতে পারছে না। কিন্তু আলম ওস্তাদের বাড়ি পৌঁছেই তার সেবায় লেগে গেল। গুরু-সেবার কোন কাজেই তার ত্রুটী হল না। গুরুর পা টীপে সে যখন শুতে গেল তখন মধ্যরাত্রি। তার শোবার ব্যবস্থা হল বড় বড় দুটো মোষ ও একটা দু'মাসের বাচ্চা মোষের পাশে। বাতাসে পায়খানার দুর্গন্ধ।

আহাম্মদ আলি বাংলা দেশ থেকে বেশ মোটা টাকাই কামিয়ে এনেছেন। রাজা জগৎকিশোরের বাড়িতে থাকাকালীন তার এক পয়সাও খরচ ছিল না। যা পেত সবই জমত। তার ওপর মাঝে মধ্যে বখশিশও ছিল। আলমও পেত তার ছিটে ফোঁটা, কখনো তবলা বাজিয়ে, কখনো সারেঙ্গী সংগত করে। বিদেশে থাকতে সংসারের খরচ ছিল আলমের হাতে, তাছাড়া এদিক ওদিক থেকে ওস্তাদজী ওকে পাইয়েও দিতেন কিছু কিছু। ও যে তার একটি পয়সাও ছুঁয়নি তা কে জানত! সেই সঙ্গে নিজের রোজগারের আয়টাও ধরে দিল। গুরু দক্ষিণা। সবাই হাঁ হয়ে রইল যখন আলম টোপলা খুলে একগুচ্ছের টাকা বের করে দিল।

আহম্মদ আলির বৃদ্ধা মা বললেন, "ঐ শুকনো ময়লা গন্ধে কি মানুষ বাঁচে।" আলমের কপাল ফিরল। ওস্তাদের ঘরের উদাল বারান্দা পেল শোবার জন্যে। কিন্তু দুঃখ এল অন্যদিক থেকে।

আলমের পয়সা দিয়ে পাকা বাড়ি সুরু করলেন আহাম্মদ আলি।

ইঁট কাটানো হল। দিনের পর দিন সেই ইঁট বাড়িতে বয়ে আনা হ'ল। সকাল সন্ধ্যা আলম এক বাড়ির ইঁট একাই বইলে। বাকি সময়টা কাটল মোষ চরিয়ে। জন রাখবার মেলাই ঝামেলা, আহাম্মদ আলি তা' আর করলেন না—আলমইতো রয়েছে।

মোকাম তৈরি হল ঠিকই, তবে আলমের দেহটা এবার সত্যিই ভেঙে পড়ল। মাঝে মাঝেই পেটে অসহ্য যন্ত্রনা হয়। কিন্তু মুখে তার রা'টি নেই। আহাম্মদ আলি ভাবলেন—না, ছেলেটার সরোদ শেখার রোক মরেছে। যখন নিজের ছেলে পুলেদের নিয়ে বসেন সরোদ শেখাতে, তখন আলমকে ব্যস্ত থাকতে হয় ঘরের এটা-ওটা নানান কাজে। হাঁ, সরোদ শিখতে না চাইলেই হল। থাকুক না যতদিন ইচ্ছে—থাক না যেমন আছে। মোষ-টোষ চরিয়ে খাচ্ছে, খাক। এমন বিশস্ত ছেলে তু'টি পাওয়া যাবে না।

কিন্তু আলম যে এ ভাবে বিশ্বাস ভঙ্গ করবে আহাম্মদ আলি স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি। এবারেও সেই এক কীর্তি। এবারও বিশ্বাস করে আহাম্মদ আলি আলমের ওপর বাড়ি-ঘর-দোরের ভার দিয়ে কয়েক দিনের জন্মে সপরিবারে গিয়েছিলেন গোয়ালিয়র। ফিরে দূর থেকেই শুনতে পেলেন সরোদের আওয়াজ। আহাম্মদ আলির মনে একটু ধুক-পুক ছিলই, দূর থেকে আওয়াজ শুনে আর সন্দেহের অবকাশ রইল না। নিজের ঘরাণা যদি ঘর ছাড়া হয় তবে বংশধরদের জন্যে রেখে যাবেন কি? বংশের জিনিস যদি এ ভাবে নয়-ছয় করে তবে পিতা ওস্তাদ আবিদ আলি খাঁ জন্নত-এ গিয়েও শান্তি পাবেন না। আলম সম্বন্ধে যত ভাবেন আহাম্মদ আলি তত ভয়ে আতঙ্কে আড়ষ্ট হয়ে ওঠেন। এ কোন মানুষের পক্ষে সম্ভবে না। ছেলেটা মানুষ নয়, কোন জীন রয়েছে ওর ভেতর। আহাম্মদ আলি উত্তেজনায় কাঁপতে লাগলেন।

"ডাকাত। লুটেরা।"

আলম চুপ করে রইল। সে জানে ডাকাত বংশে তার জন্ম। ওস্তাদজীর মা বললেন, "বাবা এক হেকিমকে যদি রোগ না সারে তবে অন্য হেকিমে দেখাও। অন্য ওস্তাদের কাছে যাও না কেন বাছা!" সেইদিন রাত্রেই আলমকে বাড়ি থেকে বিদেয় করে তবে আহম্মদ আলি নিশ্চিন্ত হলেন। আবার পথে এসে দাঁড়াল আলম।

এক সঙ্গীত ছাড়া সব কিছু সম্বন্ধেই আলমের নির্লিপ্ত ভাব। যদি বাজনাই না শেখা গেল তবে কিবা পথ, কিবা ঘর, দুই-ই আলমের কাছে সমান। সে নির্বিকার নির্লিপ্ত ভাবে রামপুরেব পথে বেরিয়ে এল। নিজেকে মনে হল দাদা আফ্‌তাবউদ্দিনের মত—ফকির।

॥ বার ॥

আলম ফকির। রামপুরের বড় মসজিদে রাত্রের নমাজ পড়ে ঐ মসজিদের দাওয়াতেই শুয়ে রাত কাটিয়ে দিল। পেটের যন্ত্রণা—তাই রাত্রে খাওয়ারও কোন বালাই নেই আলমের। ভোর রাত্রে প্রথম আজানের সঙ্গে সঙ্গেই আলমের ঘুম ভেঙ্গে গেল। তাড়াতাড়ি হাতে মুখে জল দিয়ে আবার নমাজ পড়ে ঐ মসজিদেব সামনেই বসে রইল। চারিদিক সবে পরিষ্কার হয়েছে, পাখিরা কলরব করছে। মসজিদ থেকে দু'একজন লোক নমাজ পড়ে বেরিয়ে আসছে। এমন সময় প্রকাণ্ড এক জুড়ি গাড়ি টগবগিয়ে চলে গেল সামনে দিয়ে। আলম লক্ষ করলে সবাই যেন কেমন সসম্ভ্রমে অভিবাদন জানাতে লাগল গাড়ীতে উপবিষ্ট মানুষটিকে। তাঁর

মণিমুক্তাখচিত টুপিটি ঝিক্‌মিকিয়ে উঠল ভোরের স্বপ্নালু আলোয়।

আলম ফকির। তার সব কিছুতেই কেমন একটা ঔদাসীন্য। গাড়িটা চলে যেতেই আশে পাশের লোকেরা সসম্ভ্রমে কি যেন সব বলাবলি করতে লাগল। যেন ওঁর দর্শন পেয়ে সকলে কৃতার্থ, ভাগ্যবান। হঠাৎ কানে এল, মিঞা তানসেন ··এই গুটিকয় শব্দ যেন আলমের শিরা উপশিরায় শিরশির করে বয়ে গেল। গা-টা কেমন কাঁটা দিয়ে উঠল যেন। আলমের সামনে দিয়ে এইমাত্র যিনি চলে গেলেন তিনি হচ্ছেন মিঞা তানসেনের মেয়ের দিকের একমাত্র বংশধর ওস্তাদ ওয়াজীর খাঁ সাহেব। আলমের ইচ্ছে হল ঐ গাড়ীর চাকার ধুলোর মধ্যে লুটিয়ে পড়ে।

ই-আল্লা! এঁর জন্যেইতো ঘুরে মরছে অন্ধের মত। সারা ভারত তোলপাড় করে বেড়াচ্ছে। শেষ পর্যন্ত তা'হলে তাঁর দর্শন মিলল! আলমের নিজের চোখ কাণকেও যেন বিশ্বাস করতে ভয় হয়। এত সহজ কি হবে? ঘর ছাড়া, মা-বাবা ছাড়া, নোলকপরা নববধূ মদিনা! মদনমঞ্জরি—আহারে বেচারা! সবকিছু পেছনে ফেলে আসার দুঃখ, অনুশোচনা, পথের কষ্ট, গ্লানি, পেটের যন্ত্রণা, যেন নিমেষে ভুলে গেল আলম। ধন্য! ধন্য! আলম নিজেকে ধন্য জ্ঞান করতে লাগল। কিন্তু নিজেও জানত না—এঁরই সন্ধানে সে ঘুরে মরেছে এত কাল।

আর হঠাৎই যেন তার মনে হল সে এখন মুক্ত। আজ সকালে এই মুহূর্তে আয়েস করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে সূর্যোদয় দেখতে পারে, কেউ কিছু বলবার নেই। বেরিয়ে পড়ল পথে। বগলে বাক্সবন্দী বেহালা, হাতে ক্ল্যারিয়োনেট। কপর্দকহীন আলম চলেছে পথে পথে।

ওয়াজীর খাঁ-র দর্শনের প্রাথমিক উত্তেজনাই সারা দিনমান

আলমকে অভিভূত করে রাখল। পেটে দানা নেই, মাঝে মাঝে অসহ্য যন্ত্রণা—সব কিছুই সে উপেক্ষা করে চলল। আজ যেন সে দুঃখ কষ্ট ভোগ করার একটা অর্থ খুঁজে পেয়েছে। কল্পলোকে ডানা মেলে দিয়েছে তার মন। একবার দর্শন যখন পেয়েছে তখন উপায় একটা হবেই। আনন্দে মশগুল আলম। কিন্তু কিভাবে-কেমন করে-কবে ? —এই সব বাস্তব প্রশ্নগুলির দিকে আলমের মোটেই খেয়াল নেই। সে যেন হাল্‌কা হাওয়ায় ভর দিয়ে ভেসে চলেছে। কিন্তু তার দেহ তাকে জানান দিয়ে যেতে লাগল—সূর্যাস্ত কালে যেন তা ভেঙে পড়তে চায় ক্লান্তিতে। আলম সারাদিন ঘুরেছে বহু জায়গায়। কিন্তু ঠিক ঠিক দেখেনি কিছুই। ক্লান্তদেহটা টেনে টেনে চলেছে সে। একটা ব্যারাক-বাড়ীর পাশে কে যেন খেঁকিয়ে উঠল আলমের ওপর। আলম থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে গেল। প্রথমটা বুঝতেই পারেনি লোকটা কাকে কি বলছে। মিলিটারী হাফপ্যাণ্ট পরা, মিলিটারী সার্ট গায়ে। জুল্‌ফি আর গোঁফ এক হয়ে গেছে তার বিরাট মুখখানাতে। পাক ধরেছে মাথার চুলে। বিরাট চওড়া বুক। খেঁকিয়ে বলল, "এই তোর বাবার সময় হল।"

হিন্দুস্থানীর সঙ্গে পোস্ত মিশিয়ে গজরাতে লাগল, "তোর বাপ কৈরে ? ব্যাটা তুই কি একলা বাজাবি। সব ব্যাটাকে ধরে ধরে কেবল দৌড় করাতে হয়, নয়ত কোপা মাটি। পাঁচটা বাজিয়ে এলেন, তাও আধখানা বললেও ভুল বলা হয়, তুই ব্যাটা একটা সিকি। এক থাপ্পড় মারলে আর একটা কোথায় মারব।"

লোকটা অনর্গল আলমের ওপর তম্বি করে যেতে লাগল। কোন কথা শুনতেই চায় না। আলমও কিছু বলবার চেষ্টা করল না। চেষ্টা করা বৃথা। যদি কথা ছেড়ে সত্যি সত্যি হাত চালায়। লোকটা আলমের ঘাড় ধরে একরকম শূন্যে তুলে হিড়্ হিড়্ করে

নিয়ে ঢোকাল ঐ লম্বা ব্যারাকের মত ঘরটার মধ্যে। তারপর গড়্‌গড় করে বলল, "বুড়ো ধেড়েকে না পেলুম, হাতের পাঁচ এই সিকিটাকেইতো আটকাই। কিছু একটা না দেখতে পেলে ক্যাপটেন সাহেব হয়ত আমার গর্দানটাই—"

লোকটা এমন অঙ্গভঙ্গি করল যেন কেউ তার শিরচ্ছেদ করছে। আলমকে এনে দাঁড় করাল লম্বা ঘরটার একধারে—কাঠের পাটতন করা, কোমর সমান কাল কাপড়ে ঘেরা জায়গাটায়। সেখানে রয়েছে একটা অর্গ্যান, একটা ব্যাগ পাইপ, দুটী বড় কর্তাল, একটা সাইড-ড্রাম! লোকটা আলমের বেহালাটা ইঙ্গিতে দেখিয়ে আবার খেঁকিয়ে উঠল' "ওটা বাজাতে পারিস—না—ওটা তোর মাথায় ভাঙবার জন্যে।" এদিক ওদিক দেখে বলল, "মনে হচ্ছে ওটা তোর মাথাতেই ভাঙতে হবে, যে ধেড়েটা বলে গিয়েছিল ঠিক সন্ধ্যেয় আসবে—না এলে ওর মাথাটা পাব কোথায়, এখন তোকে পাঠিয়েছে—আর ওদিকে ক্লাবের মেম্বাররা এল বলে।"

আলমকে ওখানে দাঁড় করিয়ে লোকটা ব্যস্ত সমস্ত হয়ে অন্য দিকের তদারকিতে দৌড়ঝাঁপ্‌ আরম্ভ করল। লম্বা ঘরটার মধ্যে চার পাঁচজন লোক টেবিল চেয়ার নিয়ে টানাটানি করে ঘরময় বিছিয়ে দিচ্ছে, কেউ ঝাঁটপাট দিচ্ছে। লোকটা "ইহাঁ রাখো" "উহাঁ হটাও" এমনি সব আদেশ নির্দেশ দিয়ে খামোকা চিৎকার চ্যাঁচামেচি করে সরগরম করে তুলল। পারে যদি এই মারে কি সেই মারে। একটা লোক চারদিকে মোমের আলো জ্বালতে জ্বালতে আলমের আপাদমস্তক দেখে বলল, "নতুন ভর্তি হলে, তা বেশ। আমাদের হাবিলদার সাহেব লোক ভাল। তবে হাঁ—মাঝে মধ্যে যদি সত্যিই গাঁট্টা মারে, তবে তোর যা চেহারার ছিরী নির্ঘাৎ তোর মুণ্ডু খসে পড়বে ধড় থেকে, এ আমি হলপ করে বলতে পারি।"

আলম এখন পর্যন্ত ব্যাপারটার মাথামুণ্ড কিছুই অনুধাবন করতে

পারল না। হাবিলদার সাহেব কে, কেন তাকে ধরে আনা হল, এখানে হয়ই বা কি, কোন কিছুরই হদিশ নেই। আলমের কাছে সব কিছুই তালগোল পাকিয়ে গেল। ভয়ে সে কোন কথাই বললে না।

সন্ধ্যা হতেই একজন দু'জন করে সামরিক পোষাক পরা লোক ঢুকতে লাগল এই হল ঘরে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সামরিক লোকজনে হল ঘরটা সরগরম হয়ে উঠল। এখানে ওখানে টেবিলে তাদের আড্ডা বসল। কেউ কেউ বসল গ্লাস নিয়ে। চলল হৈ-হল্লা। হাবিলদার রক্তচক্ষু করে চাপা গর্জনে বেহালাটা দেখিয়ে বলল, "ওটা তোর মাথাতেই ভাঙতে হবে। ধেড়েটা কোথায়? তোকে দিয়ে ওটা পাঠিয়েই খালাস। বাজাবে কে? খোল ব্যাটা।"

হাবিলদার বাঘের মত থাবা বাগিয়ে রইল, যেন একটু এদিক ওদিক হলেই মৃত্যু। আলম ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বেহালাটা বের করল। হাবিলদার সাহেব দাঁত কিড় মিড় করে বললে, "বাজাও"।

আলম বেহালাতে সুর তুলল। ফোর্ট উইলিয়ামের ব্যাণ্ড মাস্টার লবো সাহেবের শিক্ষা আলমকে এ যাত্রা রক্ষা করল। দু'মিনিটের মধ্যে সারা হলে গুঞ্জরণ উঠল। সবাই ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে আলমের দিকে তাকাতে লাগল। মিলিটারী পাহারার মত হাবিলদার আলমের পাশে দাঁড়িয়ে। বড় একজন অফিসার হাবিলদারকে ডেকে কি যেন শুধালো। হাবিলদার আবার এসে তার স্বস্থানে দাঁড়াল। বাজনা শেষ হলে সবাই হাততালি দিয়ে আলমকে অভিনন্দন জানালে। হাবিলদার গর্বে গোঁফে চাড়া দিয়ে মুচকি হাসল, তারপরে আলমের দিকে ফিরে রক্ত চক্ষু ঘুরিয়ে বলল, "দুসরা বাজাও।"

আলম একের পর এক গৎ বাজিয়ে গেল। রাত্রি যখন এগারটা তখন সৈনিকদের এই আসর ভাঙল। একে একে সবাই বিদায় নিল।

হাবিলদার সাহেবের মনটা ভেতরে ভেতরে নরম হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু নরম দেখালেই ব্যাটারা মাথায় উঠে নাচবে। সে গম্ভীর হয়ে বললে, "যাও ছুট্টি"।

"কৈ যামু?" আলমের অজান্তেই যেন কথাটা বেরিয়ে এল। এই তার প্রথম কথা। তারপরেই নিজেকে সামলে নিয়ে বেহালাটা বগলে ফেলে আলম বেরিয়ে পড়তে গেল। হাবিলদার ভুরু কুচকে চোখ ঘুরিয়ে বলল, "দাঁড়া।" তারপরে আপাদমস্তক দেখে বলল, "তোর নাম? তোর ঘর?"।

॥ তের ॥

আলমের জবাব শুনে হাবিলদারের চক্ষু স্থির। সে আগাগোড়াই ভুল করেছে। সৈনিকের এই ক্লাবে আজ থেকে নিয়মিত চুক্তিতে পাঞ্জাব রেজিমেন্টের এক অবসরপ্রাপ্ত ব্যাণ্ড বাদকের আসার কথা ছিল, কোথায় পাঞ্জাব রেজিমেন্টের অবসরপ্রাপ্ত ব্যাণ্ড মাষ্টার, আর কোথায় ভেতো বাঙালী আলম। বেহালা হাতে আলমকে ক্লাবের সামনে দেখে হাবিলদার ভাবলে, এই ছোক্‌রাকে ঐ ধেড়েটাই বুঝি পাঠিয়েছে।'

উঃ! আলম আজ কি বাঁচানটাই না বাঁচিয়েছে! নইলে ক্যাপটেন-মেজরদের সামনে তার নাক-কান ঘষে যেত। হাবিলদার হুঙ্কার দিয়ে উঠল, "কাহা যায়েগা। আমি যতদিন এই ক্লাবের কেয়ারটেকার, তুই ততদিন এই ক্লাবের ব্যাণ্ড মাষ্টার।"

তাজ্জব কি বাৎ! হাবিলদার সাহেব এই প্রথম নজর করল, যে ব্যক্তির সঙ্গে এই ব্যাণ্ড বাজাবার বন্দোবস্ত হয়েছিল তার সঙ্গে এ ছোঁড়ার কোন মিলিই নেই। সে আঁৎকে উঠল যখন জানল ছোঁড়াটা

বাঙালী। হাবিলদার সাহেব জাতে পাঠান। রুজির জন্যে ইংরেজের সৈন্য বিভাগে কাজ করলেও পাঠান কখনো ইংরেজের বশ্যতা স্বীকার করে না। এদিক ওদিক হলেই পাঠানরা বন্দুক বাগিয়ে ধরে অত্যাচারীর দিকে। ওদিকে বাঙালীরা বোমা পিস্তল নিয়ে রুখে দাঁড়াচ্ছে ইংরেজের বিরুদ্ধে। এ কাহিনী ভারতে যে যভাবেই গ্রহণ করে থাকুক—পাঠানরা-কিন্তু বুকে চাপড় দিয়ে বলেছে, "সাবাস্ বাঙালী।" এই সাড়ে ছয় ফুট লম্বা পাঠানটি পাঁচ ফুট দুই ইঞ্চি লম্বা মাথা সর্ব্বস্ব রোগা পটকা বাঙালীটার দিকে জুলজুল করে খানিকক্ষণ চেয়ে রইল। তারপর তার চওড়া বুকে চাপড় দিয়ে বলল, 'কুচ পরোয়া নেই। তুই থাকবি এই ক্লাবেই। আমি আছি।"

মুহূর্ত্তেই ঠিক আগের মত ব্যস্ত হয়ে পড়ল। মেয়ের নাম ধরে ডাকাডাকি করতে লাগল।

যেই ভাবা সেই কাজ। হাবিলাদারের মতই আবার হম্বিতম্বি আরম্ভ হল। আলমের বুকের মধ্যে আবার ধড়াস ধড়াস করতে লাগল। এই দশাসই জোয়ানের হম্বিতম্বিতে তার কুটির থেকে যে বেরিয়ে এল সে বার কি তের বছরের রিণরিণে একটি মেয়ে। ঠিক মোমের পুতুলের মত, মাথায় কোকড়ানো চুল, শিলওয়ার কুর্তা পরা, মাথায় ওড়না টেনে দিল। কোন ভয় ডর নেই। পোস্তু ভাষায় কি বলছে তা ঠিক ঠিক ঠাহর করতে পারছে না আলম। তবে বুঝতে পারছে খুবই তারিফ বাতলাচ্ছে। মাঝে মধ্যে 'বাঙালী' 'বাঙালী' বলে পাঠান বুকে চাপড় মারছে। মেয়েটা যেন কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছে না—এই রোগা প্যাটকা হ্যাল হ্যালে মাথা বড় ছেলেটা বাঙালী বাবু। যে কিনা মাথার ভারেই নুয়ে পড়ছে। পাঠান এবার আলমের নাম শুধাল। আলম ভয়ে ভয়ে জবাব করলে, "আলাউদ্দিন খাঁ, নিবাস—"

"সাবাস।" পাঠান নিজের বুকে চাপড় মারল। যেন ওযে বাঙালী এর চেয়ে বড় প্রমান আর কি চাই। এই ছোট্ট মেয়েটির অনুমোদনের ওপর এই ছ' ফুট লম্বা পক্ক কেশ পাঠানের আলমকে রাখা না রাখা নির্ভর করছে। বড় বাতাবি লেবুর মত আলমের গোল মাথাটার ওপর থাবা রেখে এদিক ওদিক ঘোরাতে ঘোরাতে পাঠান বলল, "বাঙালীর এই মাথা আর পাঠানের এই হাত এ দুই এক হলে ইংরেজ খতম।"

কথাটা বলেই পাঠান কেমন থতমত খেয়ে গেল। এদিক ওদিক দেখে নিজেকেই ধমক্ দিয়ে উঠল। "চোপ! যাদা বাৎ মৎ। কাম কর কাম। আপনা আপনা কামমে যাওরে বাপু। চল ব্যাটা!" আলমের পিঠে চাপড় দিয়ে হিরহির করে আবার সেই বড় ব্যারাকের দিকে লম্বা পা ফেলতে লাগল যেন ঐ বার কি তের বছরের মেয়েটির কাছে আলমকে ইনটারভিউ দিইয়ে পাশ করিয়ে নিয়ে বিজয় গর্বে চলল।

ব্যাণ্ড মাষ্টার হিসাবে আলমের চাকরি হয়ে গেল সৈনিকদের এই সান্ধ্য ক্লাবে। এখানেই তার থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা হল।

॥ চোদ্দ ॥

কিন্তু এ সুখ আলমের সইল না। সেই যখন ওস্তাদের বাড়ি তৈরির ইঁট টানত সারাদিন ধরে তখন মাঝে মধ্যে পেটের ভেতর কি রকম যেন চিনচিন করে উঠত। বেলা গড়িয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে যেন ব্যাথাটা মোচড় দিয়ে উঠত। হাবিলদারের আশ্রয়ে আসার পরের দিনই দুপুরে আলমের পেটের মধ্যে আবার সেই রকম মোচড় দিয়ে উঠল। এবার একেবারে অসহ্য। ব্যাথার চোটে যেন হুস থাকে না। মেঝেয় পড়ে তার সেই ছোট্ট দেহটা কুক্‌ড়ে কুক্‌ড়ে ওঠে।

শারীরীক কষ্ট আলমকে কোন দিনই কাবু করতে পারেনি, কিন্তু এবার একেবারে মুহ্যমান। হয়ত অপ্রাপ্তির বেদনা মিসে একে অসহ্য করে তুলছে। দীর্ঘ কষ্টবহ তীর্থ যাত্রা শেষে ভক্ত যদি ব্যর্থ হয় দেবতা দর্শনে সে কষ্ট বলবেই বা কাকে, সইবেই বা কি করে। সেই অসহ্যতর যন্ত্রনায় আলমের সব কিছু তলিয়ে যেতে লাগল। তার আচ্ছন্ন চেতনায় সব কিছু যেন কেমন তালগোল পাকিয়ে যেতে লাগল। ভরসার স্থল, শেষ অবলম্বন সেই মাকেই শেষ পর্যন্ত আসতে হল। আলমের মাথাটি কোলে নিয়ে বসলেন তিনি। যেন অতল অন্ধকার শূন্যে তলিয়ে যাবার মুহূর্তে তিনি কোলে তুলে নিলেন। আলম চম্‌কে দুহাতে আঁকড়ে ধরল মাকে। মার কোলে সেই নোলক পরা মেয়েটি; যার সঙ্গে নাকি আলমের বিয়ে হয়েছিল। সে খুব হাসছে। কেমন মজা। এখন বোঝ ঘরে বিয়ে করা বৌ ফেলে পালালে কি হয়। আমরা শাশুড়ি বৌ-এ মিলে দিনরাত কত যে কাঁদছি। এবার নিজে কাঁদ। খুব কাঁদ। বলতে বলতে মেয়েটিও

কাঁদতে লাগল আর কেমন যেন ডাগর হয়ে উঠতে লাগল। আলম শুনতে পাচ্ছে তার কান্নার শব্দ। কান্নার শব্দে আলমের কান্না দ্বিগুন হয়ে উঠল। এই অবচেতন মনেও আলম অবাক হতে লাগল মদনমঞ্জরী বাংলার আটপৌরে শাড়ি ছেড়ে এই শিলওয়ার কামিজ ওড়না জড়িয়ে এল কোথা হতে। আস্তে আস্তে মনে হতে লাগল তার ভাসাও যেন একবর্ণ বুঝতে পারছে না। এর জন্যে সে-ই দায়ী। তার অপরাধের এই হচ্ছে সঠিক বিচার। হায়! হায়! আমি একূল ওকূল দুকূল হারালাম। সে মদনমঞ্জরীকে দু'হাতে আঁকড়ে ধরে তার অপরাধ স্বীকার করতে চাইল। ক্ষমা চাইল। সে ও কূলেই ফিরে যাবে। ভয় হতে লাগল এই হাত দুটি ছেড়ে দিলেই সে অতল অন্ধকার শূন্যে তলিয়ে যাবে। সে সত্যই তলিয়ে গেল একটা নরম ফোঁপান কান্নার মধ্যে।

একদিন একরাত যে কি ভাবে পার হয়ে গেল আলম তার কিছুই জানে না। ক্লান্ত দেহে চোখ মেলে আলমের দু'চোখ যাকে দেখবার জন্যে আকুপাকু করে উঠল আলম শত চেষ্টাতেও সেদিকে না তাকিয়ে পারল না। সঙ্কোচ-লজ্জায় তার চোখের পাতা কাঁপতে লাগল। সে মনে মনে বলতে লাগল, আমাকে যদি চোখ মেলতে হয় তবে তো এই পুব দিকের জানালা দিয়েই মেলতে হবে। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই মনের মধ্যে কেমন গুরগুর করে উঠল। দরজা জানালা খোলা কেউ কোথাও নেই।

আলম পেটের যন্ত্রণার কথা ভুলে গেল। দুর্বল মন। ভেবে বসল হয়ত আমার এই বর্বরের মত ব্যবহারই—। সে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল, দরকার হলে সে পায়ে পরে ক্ষমা চেয়ে নেবে হাবিলদারের কাছে। আশ্রয় দাতার সঙ্গে যদি বেইমানী করে তবে দোজকেও তার স্থান হবে না। গতকালের পেটের যন্ত্রণার চেয়েও যেন তার এ জ্বালা আরো বেশি অসহ্য হয়ে উঠল। হাবিলদারের ঘরের

সামনে এসে দাঁড়াল। যার চিৎকার চ্যাচামেচিতে কোয়াটার সব সময় সরগরম হয়ে থাকে তার কোন সাড়া শব্দই নেই। আলম বেশ কিছুক্ষণ উঠোনে দাঁড়িয়ে থেকে শেষ পর্যন্ত ঘরের মধ্যে উঁকি মারল। বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস করছে। এই বুঝি কেউ রিনরিনে গলায় মোমের মত আঙুল দিয়ে ওড়না টেনে বেরিয়ে আসে। আর এই বাঙালীরই মনে মনে এত কুচিন্তা ছিল জানতে পেরে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয়। কিন্তু কেউ এগিয়ে এল না। চারদিকেই কেমন থমথমে ভাব। যে খোরা সৈনিকটি আফ্রিকা না কোথায় ইংরেজদের হয়ে লড়তে গিয়ে একটা ঠ্যাং খুইয়েছে, এই ক্লাব ঘর ঝারপাট দেয়, সে এদিক ওদিক চেয়ে খোরাতে খোরাতে কাছে এসে ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিল—হাতকড়া দিয়ে হাবিলদারকে ধরে নিয়ে গেছে, মেয়েটা যে কোথায় হাপিস হয়ে গেল কেউ জানে না। কি বৃত্তান্ত? কেন? খোরা সৈনিকটি ওখানে ইতিউতি করতেও যেন ভয় পায়। আলমের পেটের মধ্যে ব্যথাটা যেন আবার চিনচিন করে ওঠে। চারদিক অন্ধকার হয়ে আসে। অন্ধকার আর হতাশা। হতাশা আর অন্ধকার। আলম সেই খানেই বসে পড়ে।

ওদিকে ভৈরব নদীতে কোন জোয়ার ভাটা নেই। শুধু বর্ষাকালে ফুলে ফেপে ওঠে। তায় নিথর গতি। শিবপুর গ্রামেও দিন যায়, কোন উত্থান পতন নেই। কেবল লোকগুলো কেমন বুড়িয়ে যায়। আলমের বাবা আর শ্বশুরের চুল দাড়িতেও পাক ধরে। তাদের বাজনার আসর তেমন আর জমে না। কোথায় কোন দুঃসাহসী নাকি সাহেবকে বোমা মেরেছে। দিনে দিনে কত কিই না শুনতে হবে। মদিনা মা-মরা-মেয়ে, বাড়ি নিয়ে গিয়ে ওকে রাখবেই বা কার কাছে। এখানে শাশুড়ির কাছে আছে থাক। দুধের বাছা। বয়স কিই বা হয়েছে। তবু মুখে মুখে বদনাম ছড়িয়ে পড়তে কতক্ষণ। পাড়ার ঠানদিরা মুখ বাঁকিয়ে বলবে ও মেয়ের কোন ভাস্থি নেই।

ঠাঁই হল না শ্বশুর ঘরে। আলমের বাবার মুখে কোন ভাষা নেই। কি কথায় যে শান্তনা দেবে বেয়াইকে! দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নাড়ে। ভৈরবের জল তেমনি গড়িয়ে যায়।

যার একুল ওকুল দুকুল গেছে তার আর বেঁচে থেকে লাভ কি? কিসের অন্বেশনে সে এখানে পড়ে থাকবে। সে কি জীবনভর এই মাতাল আড্ডাবাজ সৈনিকের আড্ডায় বেহালা, ব্যাঞ্জো কি বাঁশী বাজিয়ে যাবে, তারপরে একদিন এখানেই নিঃশব্দে মরে পড়ে থাকবে। কিসের আশে সে ঘর-দোর আত্মীয়-পরিজন ছেড়ে এই বিভুঁই বিদেশে রোগে তাপে জ্বলছে। তলিয়ে যাবার আগে যেন কুটোর মত ধরেছিল এই পাঠান হাবিলদারকে,—সেও তলিয়ে গেল। আলম ডুবছে।

দুদিন পরে আলম সবিস্তারে সব শুনল। হাবিলদারের এই মোমের মত রিনরিনে মেয়েটি বিবাহিতা! ওর স্বামী হিমালয় পর্বতের কোলে পাঠানদের দেশে রাইফেল কাঁধে ঝুলিয়ে নাকি ইংরাজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। সেখানে ইংরাজ পাঠানে যুদ্ধ চলছে। ইংরাজ হাউই জাহাজ থেকে বোমা মারছে। হাবিলদারের মেয়ের জামাই-এর পরিচয় কি করে কি করে ফাঁস হয়ে গেল। হাবিলদারকে হাতকড়া লাগিয়ে কোমরে দড়িবেঁধে নিয়ে যাওয়া হল জেলে। মেয়েটার যে কি হল কেউ জানে না। আলম ডুবল।

॥ পনের ॥

হাবিলদার আর তার রিনরিনে মেয়েটি হারিয়ে গেল, কিন্তু আলমের ব্যাণ্ড বাদনের কাজটি রয়ে গেল। মাস গেলে কিছু দক্ষিনাও পেল। সেই বার টাকা। যেখানেই কাজ করুক আলমের ভাগ্যে যেন বার টাকা লেখা আছে। টাকা কটা হাতে নিয়ে মনে মনে ভাবলে, "যাক, এবার মরার মত রেস্ত পাওয়া গেল।" একেবারে দুই তোলা আফিং কিনে বসল।

নিত্যকার আহারের কোন উদ্যোগই করল না। যদিও সে একপাত্রে ডালে-চালে খিঁচুরি পাকিয়ে দিনান্তে একবার আহার করে। আজ তাও নেই।

কোনমতে রাত পোহাল।

শীর্ণ ক্লিষ্ট দেহ নিয়ে চলল সেই মসজিদে। ঘুম ভাঙানিয়া উদাস আহ্বান আজানের সুরে। ভোরের নমাজ পড়ার পরই সব শেষ হয়ে যাবে।

নমাজ পড়া শেষ হল। একে একে সবাই বিদায় নিলে। এইতো সময়। আলম মসজিদের উঁচু বারান্দার নির্জন কোনে এগিয়ে গেল। এবার সে আস্তে আস্তে সন্তর্পণে পকেটে হাত দিয়ে কাগজে মোরা পরম জিনিসটাকে মেলে ধরল হাতের চেটোয়।

আফিংএর গোলা দু'টো হাতে ধরে হঠাৎ কেন জানি তার মনে পড়ল এই খানিক আগে শোনা আজানের সুললিত স্বরধ্বনির কথা। কি কি পর্দা ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। সিন্ধু ভৈরবীর পর্দা লাগছে। না, দুর্গার। আশ্চর্য। রোজ শুনছে তবু এ কথাতো কোনদিনই মনে উদয় হয়নি। ভারতের বাইস শ্রুতিতেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব সুর এসে মিলেছে। আলম আজানের সুর নিজের কণ্ঠে তুলে স্বর

বিন্যাসের চেষ্টা করতে লাগল। আফিংএর ঢেলা দু'টো হাতে রেখে তন্ময় হয়ে গেল আজানের সুরে। যেন সুরের পাখি ছাড়া পেল আলমের কণ্ঠে। সে মরতেও ভুলে গেল।

বৃদ্ধ বড় ইমাম সাহেব এই মধুর সুর শুনে একেবারে বিমোহিত হয়ে গেলেন। পায়ে পায়ে এসে আলমের পাশে দাঁড়িয়ে মেহেদি মাখা পাকা দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে মাথা নাড়তে লাগলেন। আলমের চোখ দিয়ে ভক্তিরসের উদাসী ধারা বইছে।

সম্বিৎ পেয়েই আলম তাড়াতাড়ি আফিংএর ঢেলা দু'টো পকেটে পুরে মাথা নত করে দাঁড়াল। ইমাম সাহেব আলমের মুখের দিকে চেয়ে বললেন, "এই বয়সে এত ভক্তি, এত উদাসী? কি হয়েছে বল।"

"আমি মরতাম চাই। দুই তোলা আফিং কিনছি।" মস্‌জিদে দাঁড়িয়ে মিথ্যে কথা বলা মহাপাপ। তাই আলম সব খুলে বলল। ইমাম সাহেব সব শুনে বললেন, "আরে তুমি জাহের আদমি আছ। শোন, হিম্মতে মুর্দা, মদতে খুদা—চেষ্টা কর, চেষ্টা করলে খুদাকেও পাওয়া যায়।"

আলমের খুদা সঙ্গীত, কিন্তু তাকে পায় কৈ? ছোট মুখে বড় নাম ধরছে বলে নিজের নাক কান মলে আলম বললে, "আমি ওস্তাদ উজির খাঁ সাহেবের নিকট বীণা শিক্ষা করিতে চাই।"

"রাজা মহারাজারা যাকে খোসামদ করে নড়াতে পারেন না।" ইমাম সাহেব প্রমাদ গুণলেন। "নাম গোত্রহীন রাস্তার লোক তুমি। হাঁ, এ খুদা প্রাপ্তির চেয়েও কঠিন কাজ।"

আলমের সেই এক অস্ত্র, যা বলে তা একেবারে অন্তর থেকে বলে। হয় ওয়াজীর খাঁর নিকট সঙ্গীত শিক্ষা, নয় মৃত্যু। হাঁ, ছেলেটা মরবেই।

ইতিউতি করে শেষ পর্যন্ত সাব্যস্ত হল, ইমাম সাহেব নবাবের

উদ্দেশ্যে উর্দু'তে একটা আর্জি লিখে দিলেন। —"আমি ত্রিপুরা নিবাসী বাঙালী। নাম আলাউদ্দিন খাঁ। পিতার নাম সাছুখাঁ। গ্রামের নাম শিবপুর। আমি সঙ্গীত শিখিবার আশায় এতদূর আসিয়াছি—অন্যথায় আমি……"

এক পকেটে আর্জি আর এক পকেটে আফিংএর ঢেলা, জীবন-মরন-পাশাপাশি। হাতে বেহালা,—আলমতো বেরুল মস্‌জিদ থেকে। যেন লভ্যবস্তু তার হাতের মুঠোয়। খুদার উত্তরীয়ের হাওয়া যেন লাগছে গায়ে। কিন্তু দু'পা এগিয়েই তার সে ভুল ভাঙল। যাকে শুধায় সে-ই তার মুখের দিকে হাঁ হয়ে থাকে। আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করে নবাব বাহাদুরের কাছে আর্জি আছে? ওয়াজীর খাঁ সাহেবের কাছে সঙ্গীত শিক্ষা করবে? সাধারণ রামপুর-বাসীর কাছে ব্যাপারটা বোধগম্যই হয় না। চালাক চতুর যারা তারা ভাবে ব্যাটা বুজরুক। একজন সহৃদয় ব্যক্তি আর্জিটা উলটে পালটে দেখে বললে, "আমিতো এ পাড়ায় থাকিনা বাছা।" কে যেন মন্তব্য করলে, "ঐ লেখা লেখির মধ্যেই বাঙালীদের যত জারিজুরি।"

আট বছর বয়সে মায়ের কোল ছেড়ে যে এতদূর পথ অতিক্রম করেছে, পথে খুইয়ে এসেছে চোদ্দ বছর। তার পক্ষে ওয়াজীর খাঁর কুঠি বের করা কিছু মুশকিল নয়, কিন্তু কিঞ্চিৎ গোল বাঁধল যখন দারোয়ান ব্যাটা তার ঐ মহান আর্জির কোন মর্মই বুঝতে চাইলে না এবং নাছোরবান্দা আলমকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দিলে।

আবার পথে!

তখনো তার মৃত্যুর বাকি আছে। সন্ধ্যা হয় নি। সে চলল নবাব প্রাসাদ হামিদ মঞ্জিলের দিকে। সেখানে পৌঁছে তার ঘাড় ধাক্কার প্রয়োজন হল না, সে এমনিতেই বুঝে নিল আসন্ন সন্ধ্যায় তাকে আফিং-এর গোলা দু'টো মুখে পুরে দিতেই হবে।

একটু একটু করে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। একটু একটু করে মৃত্যু। কেউ কিছু বোঝবার আগেই চারদিক থেকে গেল গেল রব উঠল। নবাবের গাড়ি আটক। সেপাই সান্ত্রীরা সভয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লে। রামপুরে অভূতপূর্ব ঘটনা! কার এমন বুকের পাটা নবাবের গাড়ির সামনে অমন দুহাত তুলে দাঁড়ায়। এক হাতে খাপসুদ্ধ বেহালা আর হাতে ক্ল্যারিয়োনেট। ঘোড়া দুটো লাফিয়ে উঠেছিল। আর একটু হলেই ছোঁড়টা ঘোড়ার খুরে পিষে যেত। নবাবের ঘোড়া দুটো নাহক যখম হত। দেহ রক্ষীরা কে কার আগে ছোঁড়াটার টুঁটি টিপে ধরবে! চার পাঁচজন সান্ত্রী একসঙ্গে আলমকে ধরে টানা হেঁচড়া শুরু করে দিল।

নবাবের ইঙ্গিতে বন্দীকে তার সামনে হাজির করা হল।

মৃত্যুর চেয়ে আর কি ভয়ঙ্কর হতে পারে। আলম ফস্ করে পকেট থেকে আর্জিটা বের করে নবাবের দিকে এগিয়ে ধরলে। নবাবের একান্ত সচিব আর্জিটা পড়ে হতভম্ব হয়ে গেল। বার বার অপাঙ্গে দেখতে লাগল আলমকে। বিষয়টা কি ?

"... ..অন্যথায় আমি আফিং খাইয়া প্রাণ ত্যাগ করিব।"

নবাব হাত বাড়িয়ে আর্জিটা নিয়ে পড়লেন। "তুমি বাঙালী ?"

আলম মাথা নাড়ল।

"হিন্দুস্থানের জঞ্জাল! তুমি মরবে? না, আমাকে বোমা মারতে এসেছ ? ওর জেব তল্লাস কর।"

বাঙলার অগ্নিযুগের বিস্ফোরণ সারা ভারতের গোয়েন্দা বিভাগকে সতর্ক করে রেখেছে। নবাবেরও অগোচরে নেই। সন্তর্পনে বেহালার বাক্সটা খোলা হল। ওর থেকে বেহালাটাই পাওয়া গেল। আলমের পকেট থেকে বেরুল দুই তোলা আফিং। নবাব বাহাদুর অবাক। হাতে নিয়ে শুকে পরখ করে লোফাতে লোফাতে বললেন, "ওয়াজীর খাঁ তার বংশের বাইরে কাউকে শেখায় না।"

"আমার আফিং আমাকে দিন হুজুর। আমার আর পয়সা নাই।"

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ। মৃত্যুর লগ্ন বয়ে যায়। নবাব বাহাদুর কি ভেবে আফিং-এর গোলা দুটো ফেরত না দিয়ে একান্ত সচিবকে হুকুম দিলেন, "ওকে হামিদ মঞ্জিলে পেশ কর।"

একান্ত সচিব ধোঁকায় পড়ল। এ রহস্য না আদেশ!

সঞ্চারী

শিক্ষা দীক্ষা পরীক্ষা

রামপুর - কলকাতা - মাইহার

॥ এক ॥

হামিদ মঞ্জিলে নবাব হামেদ আলি খাঁর আশ্রিত কি গায়ক, কি যন্ত্রী—মেলাই রয়েছে। ব্যাণ্ডের বাদ্যকারগণ—সব মিলিয়ে তিন শ'র কম হবে না। সঙ্গীত মুখরিত পরিবেশ। সকাল সন্ধ্যা ব্যাণ্ড বাজে। বড় বড় ওস্তাদের আসর জমে। সকলের শীর্ষে রয়েছেন ওয়াজীর খাঁ। কিন্তু সেখানে নবাব ভিন্ন আর কারো গতিবিধি নেই।

তাই নবাব হামেদ আলি খাঁ তার একান্ত সচিবকে ডেকে বললেন, "ব্যাণ্ড মাস্টার মহম্মদ হুসেন খাঁ-কে বলে দাও, ওর পরীক্ষা নিক। যদি পারে, কাল থেকে ও ব্যাণ্ডে বেহালা বাজাবে।"

ভেতো বাঙালী! দু'টি ভাতের ব্যবস্থা হলেই সব ঠাণ্ডা। আর তার জন্যেই যত ভনিতা। কিন্তু আলম গোঁজ হয়ে রইল। হয় সঙ্গীত শিক্ষা, নয় মৃত্যু।

"আমি নকৃরি করব না।"

আলমের মাথা বড়, পল্‌কা দেহ, কিন্তু কণ্ঠে এমন সুর বাজল—যার জন্যে নবাব বাহাদুর প্রস্তুত ছিলেন না। অদ্ভুত আর্জি। কোন হিসাবে ধরে না।

"তুমি আমার সঙ্গে বাজাতে পারবে," নবাব বাহাদুরের প্রশ্ন। আলমের সোজা জবাব, "হ, পারমু।"

নবাব ধরলেন বেহাগের হোরি, "যমুনা জলে সখি ক্যাঁয়াস যাযুঁ।" সঙ্গে দরবারের সেরা তবলচি।

আলম বেশ দাপটের সঙ্গে সাথ-সঙ্গত করে গেল। ডাকাতি করা সুর তুলল বেহালায়। নবাব বললেন, 'বহুৎ আচ্ছা।'

"হুজুর" আলম আবেগ ভরে বলে উঠল, "আর একটা গান।"

"হুকুম করছ!" পাশ থেকে একান্ত সচিব ধমক দিয়ে উঠল। সঙ্গীত রসিক নবাব হেসে বললেন, "ঠিক ঠিক বাজিয়ে আমাকে হারিয়ে দিয়েছে। ওর কিছু জুলুমতো সহ্য করতেই হবে।"

নবাব বাহাদুর এবার ধরলেন টপ্পা। টপ্পার গিট্‌কারীর গোলক ধাঁধায় আলম হারিয়ে গেল। বেহালা থামিয়ে মন্ত্র মুগ্ধের মত চুপ করে বসে রইল। গান থামলে করজোড়ে বলে উঠল, "খুদা জানেন। এ জিনিস আমি কুথায় পামু, আমাকে শেখান—অন্যথায়—"

সেই এক বুলি। শেষ পর্যন্ত নবাব বাহাদুর তার একান্ত সচিবকে পাঠিয়ে ওয়াজীর খাঁ-কে ডাকিয়ে আনলেন হামিদ মঞ্জিলে। আবার পরীক্ষা হল সুরু। এবার সরোদ দেওয়া হল আলমের হাতে। সেই চুরি ডাকাতি করা সম্পদে তার সুর সাজাতে লাগল আলম। কিসের ইঙ্গিত পেয়ে যেন একটু নড়ে চড়ে বসলেন ওয়াজীর খাঁ। তার ভুরু কুঞ্চিত হল। "আমাদের ঘরের ইমন ওর হাতে গেল কি করে!" নবাবও বিস্মিত!

সুরের এই ডাকাতিতে আলম নির্দোষ। আলমের অজান্তেই এ জিনিস তার হাতে এসেছে। ওয়াজির খাঁ চিন্তিত ভাবে শুধালেন, "ওর নিবাস?"

"ত্রিপুরা। শিবপুর গ্রাম। পিতার নাম—"

"ও", এই ইমনের সূত্র যেন ওয়াজীর খাঁ খুঁজে পেলেন। আত্মস্থ হয়ে স্বগত উক্তি করলেন, "আমার মামা কাসেম আলি ছিলেন ঐ ত্রিপুরার দরবারে।"

"আমার আব্বাজান তার কাছে সেতার শিখেছেন হুজুর" আলম বললে। এ সুর আলম শেখেনি। এ সুর তার অবচেতন মনে, রক্তে।

ওয়াজীর খাঁর কাছে জিনিসটা পরিস্কার হয়ে গেল। সর্তক

মৌনতা। আলমের বুকের মধ্যে হাতুড়ি পিটতে লাগল। সঙ্গীত স্বর্গের সিংহদ্বারে পৌঁছে কি তার পতন ঘটবে।

নবাব বাহাদুর ভাল করেই জানেন ওয়াজীর খাঁ-র ধারা। তানসেন বংশের রক্ত না থাকলে তার দুয়ার বন্ধ। খাঁ সাহেবকে নরম করার জন্যে নবাব বললেন, "কাসেম আলি ওর বাবাকে তালিম দিয়েছেন—দেখুন এ আপনার তালিম পাবার যোগ্য কি না?"

সন্ধ্যা থেকে এখন পর্যন্ত যা যা ঘটেছে তা পূর্বাপর বললেন। ওয়াজির খাঁ নবাব বাহাদুরের মনগত বাসনা বুঝে বললেন, "বেশ, হুজুর যখন বলছেন তখন আমি ওকে সরোদের তালিম দেব।"

"বীণা?" নবাব বাহাদুর যাচাই করেন।

"মাপ করবেন হুজুর, পূর্বপুরুষের নির্দেশ, নিজের ছেলে ভিন্ন ও বিদ্যা আমি কাউকে শেখাতে পারি না।" স্থীর প্রতিজ্ঞ জবাব এল ওয়াজীর খাঁ-র কাছ থেকে। এর ওপর আর হুকুম চলে না। ঠিক হল আলম সরোদই শিখবে।

পরের দিনই সব ব্যবস্থা ঠিক হয়ে গেল। হামিদ মাঞ্জিলেই 'নাড়া' বাঁধার অনুষ্ঠান হল। নবাবের হুকুম। মিঠাই এল। মস্ত সাদা পাগরি বাঁধা হল আলমের মাথায়। দরবারের যতেক গায়ক যন্ত্রী সব উপস্থিত রইল অনুষ্ঠানে। কেউ ঈর্ষা কাতর, কেউ বা রগড় দেখছে—বড় লোকের খেয়াল! এদিকে বাঙালীর পল্‌কা ঘাড় পাগরির ভার সইলে হয়।

ধূপ-ধুনো জ্বালিয়ে ওয়াজীর খাঁ প্রথমে 'নাড়া' বাঁধলেন নবাবের হাতে, প্রথম শিষ্য। তাকেই প্রথম বরণ করতে হয়। তারপর আলম, আলাউদ্দিন খাঁ। বাঙালী। পদ্মার ওপারে নিবাস।

ওয়াজীর খাঁ আলমের হাতে 'নাড়া' বেঁধে বললেন, "আলাউদ্দিন সত্য কর—আমার বিদ্যা কুপাত্রে দেব না। কুসঙ্গে যাব না। বিদ্যা ভাঙিয়ে ভিক্ষা করব না। বাইজী-বারাঙ্গনাকে গান শেখাব না।"

গুঞ্জন ছিল রামপুরের বাতাসে। একান্ত সচিব এই বাঙালীবাবু সম্বন্ধে কালই খবর দিয়ে রেখেছিল ইংরেজ গোয়েন্দা বিভাগকে। তারা এসে নবাবের কাছ থেকে খোঁজ খবর নিয়ে গেছে। রহস্য করে নবাব বাহাদুর শুধালেন, "বাঙালী বাবু, বোমা টোমা মারবে না তো?"

'না না হুজুর!' আলম সরোদটা বুকে ধরে পাগরিসুদ্ধ বড় মাথাটা ডাইনে বাঁয়ে দুলিয়ে কাতর ভাবে বললে, "আমি সুরের কাঙাল।'

হ..সুরের বোমা মারবার পারি।

॥ দুই ॥

এই প্রথম আলম তার সৌভাগ্যের কথা জানিয়ে বাবার কাছে সবিস্তারে পত্র দিল। '—চুপসা মিয়ার কবরের কাছে আমি একটা ঘর লইয়াছি। একটা ফটক আছে। অপর দিকে গুরুর বাড়ী, আরেক অপর দিকে দরগা—'

সাত সকালে আলম সরোদ কোলে হাজির হল ওয়াজীর খাঁর বাড়ী। বৈঠকখানার দুয়ারে দাঁড়িয়ে রইল দারীর মত। আটটার আগে ওয়াজীর খাঁ ঘুম থেকে ওঠেন না। রাত বারটার পর থেকে সুরু হয় তার সঙ্গীত সাধনা। চলে গভীর রাত পর্যন্ত।

এও এক দরবার। রামপুরে নবাবের পরেই ওয়াজীর খাঁর স্থান। সাতশ' টাকা মাসোয়ারা আর হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি দিয়ে তার মান রেখেছেন নবাব। রাজ অতিথি ভিন্ন কারো সামনে তিনি বাজান না।

কারো ফরমাইসি চলে না তার ওপর। সারা ভারত সঙ্গীত

জগতের তীর্থক্ষেত্র এই রামপুর, এই ওয়াজীর খাঁর বাড়ী। কিন্তু তিনি জায়গা ছেড়ে নড়েন না এক পাও।

একবার মহামূল্য মনিমুক্তা খচিত বিরাট পাগরি মাথায় কাশ্মীরের মহারাজা স্বয়ং ওয়াজীর খাঁকে নিয়ে যেতে চেয়ে ছিলেন কাশ্মীরে। নড়াতে পারেননি। সকাল থেকে বহু বিশিষ্ট জ্ঞানী গুনীরা আসেন ওয়াজীর খাঁ দর্শনে। ভিন্ন রাজ্যের দূতরা আসেন সঙ্গীতের আমন্ত্রণ নিয়ে। গুনমুগ্ধ বন্ধু ইয়াররা আসেন। মোশায়েবরাও লেগে থাকে আঠার মত। সকলের মধ্যমনি ওয়াজীর খাঁ। রাশভারী শ্যামবর্ণ শক্ত সৌম্যমূর্তি। একটা পরিচ্ছন্ন মহিমা ছড়িয়ে থাকে তার পরিমণ্ডলে।

ওয়াজীর খাঁ কবি, নাট্যকার। তার গীতিনাট্য 'ভর্তৃহরি' অভিনীত হয় হামিদ মঞ্জিলে। কাব্য, নাটক, সঙ্গীত এই তিনে মিলে ওয়াজীর খাঁর আসর জমজমাট। সকাল থেকে দুপুর গড়িয়ে যায়। উনি চলে যান অন্তঃপুরে। আলম ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকে দ্বারীর মত। নবাব বাহাদুর বলেছিলেন, "এ বিদ্যে অর্থের বিনিময়ে কেউ ওয়াজীর খাঁর কাছ থেকে পাবে না। খিদমৎ করে আদায় করতে হবে।"

খিদমতের সুযোগও সীমিত। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকা ভিন্ন বড় একটা কিছু করার নেই। ওয়াজীর খাঁ আসর ছেড়ে ওঠার সময় আলম সসম্ভ্রমে নত হয়ে তার জুতা জোড়া এগিয়ে দেয়। খাঁ সাহেব তার পিঠের ওপর একটু চাপড় দিয়ে চলে যান। পারিপার্শ্বিকের তুচ্ছতাকে উপেক্ষা করা মজ্জাগত। বংশ গরিমার দম্ভ।

* * *

আঘাত কর, আঘাত কর, দুয়ার খুলবেই এই আপ্তবাক্য সত্যে পরিনত হল। দুয়ার খুলল। কিন্তু ভেতরে প্রবেশের অধিকার

নেই আলমের। একি দুঃসহ অভিশাপ। এ আলো যে অন্ধকারের চেয়েও কঠিন। চারিদিকে স্বর্গীয় সঙ্গীত সুধার প্লাবন। অন্তঃপুরে গুরুপত্নী সেতার বাজান, মহরমে রশিয়া গেয়ে শ্রোতাদের কাঁদিয়ে দেন। ওয়াজীর খাঁর সৃষ্ট নবতর সঙ্গীত ধারা রশিয়া।

ওয়াজীর খাঁর তিন ছেলে নসীর নজীর সগীর। তারা বিরামহীন রেওয়াজ করেন। আত্মীয় স্বজন গুরুভাইরাও যোগ দেন তাদের সঙ্গে। আর গভীর রাত্রে জেগে থাকেন সঙ্গীত সূর্য ওয়াজীর খাঁ। দুয়ারে দাঁড়িয়ে আলমের তৃষিত আত্মা আকুলি বিকুলি করে মরে। দুপুর হতেই হামিদ মঞ্জিলের রসুই খানা থেকে বাঁক ভর্তি করে খানা আসে—কালিয়া কোরমা বিরিয়ানী। ওয়াজীর খাঁ গোস্তের যম। তাই ও জিনিসটা আসে পর্য্যাপ্ত।

দ্বারে অভুক্ত প্রহরী। দিন যায়।

গুরু সেবার আর একটা মৌকা মিলল আলমের। ওয়াজীর খাঁ ঘুম থেকে ওঠবার আগে বদনা ভরে জল এগিয়ে দিল শৌচাগারে ফিনাইল দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে রাখল। একটি কথাও শুধালে না। বেলা বারটা পর্যন্ত যন্ত্র নিয়ে তেমনি দাঁড়িয়ে রইল চৌকাঠের ওপরে। এই দুঃসাধ্য সাধনায় দিনের পর দিন গেল।

আলম তার এই ভাগ্যের জন্যে কাকে দুষবে? কাকে বলবে? অম্লশূলের ব্যাথায় দেহ পঙ্গু, মন শূন্য, উদাসীন। যন্ত্রের মত আসে যায়। সকালে ভেজান ছোলা খায়। ওয়াজীর খাঁর বাড়ি থেকে ফিরে ডালে-চালে সেদ্ধ করে এক বেলা আহার করে। নিজের জামা নিজেই সেলাই করে পরে। ফকির হতে আর বাকি কি?

আলম ফকির। এতদিনে রামপুরের শিল্পী মহলে বেশ পরিচিত হয়ে উঠেছে। সবাই চেনে বাঙালী বাবু হিসেবে। তায় নবাবের কৃপা ভাজন। ওয়াজীর খাঁর শিষ্য। এতদিনে উর্দু বয়ানও শিখে নিয়েছে। কিন্তু ভেতরের খবর জানে না কেউ।

রাজা হুসেন খাঁ লখ্নৌভী ব্যাণ্ড মাস্টার। ধ্রুপদ,হোরিতে যত দখল ব্যাণ্ডে তত নয়। আলম হাবুদত্তের ছাত্র, লবো সাহেবের শিক্ষা রয়েছে তার মধ্যে। তার বেহালা শুনে হুসেন খাঁ বুঝে নিয়েছিলেন বাঙালী বাবুর এলেম। হুসেন খাঁ গৎ তৈরি করেন আলম বিনা পারিশ্রমিকে মুখ বুজে তা ভেঙে চুরে টিউন করে ঠিকঠাক করে দেয়। প্রলোভন আসে, ব্যাণ্ডে যোগ দাও, তৈরী কর নতুন নতুন ব্যাণ্ড। হুসেন খাঁ বললেন, "আমি তোমাকে অনেক ধ্রুপদ হোরি দেব"

আলম নীরব। যা পেল নতশিরে হাত পেতে নিল। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। তার পথের কোন বিকল্প নেই।

ক্রমে আলম আরো ঘনিষ্ট হয়ে উঠল নবাব দরবারের শিল্পীদের কাছে। এক অভিনব জিনিস পেল এখানে। দাড়িওয়ালা বাহাদুর খাঁ আর আলি আফাতুল। এই দুই নক্কাল। ভারতের বহু বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী দরবারে গাইতে আসেন আমন্ত্রিত হয়ে। নবাবের ইঙ্গিত পেলে ঐ দুই নক্কাল শিল্পী মূহূর্তের মধ্যে অবিকল নকল করে শুনিয়ে দেন ঐ বিশিষ্ট সঙ্গীত কারদের ধরণ ধারণ কণ্ঠস্বর ব্যাঞ্জনা মূর্চ্ছনা। এমনি তাদের মার্জিত কণ্ঠ, এমনি তাদের ধীশক্তি। আলম হয়ে উঠল নক্কালের নক্কাল।

কিন্তু বিশ্বগ্রাসী সঙ্গীত তৃষ্ণা যার নকল করা বিদ্যায় তার কতটুকু ভরবে। আবার অচিরেই ঘনিয়ে এল বিষাদ, অন্ধকার। একদিন আলম ব্যাণ্ড মাস্টার মহম্মদ হুসেন খাঁকে বলল, "আমার মা বলতেন আমি বড় হলে সন্ন্যাসী হয়ে যাব। আমার কপালে তাই লিখন। সংসার বাসে আমার আর মতি নাই।"

আলম আর পারে না। কারো বিরুদ্ধে কোন অনুযোগ নেই। কাউকে সে দুষছে না। ওপরওয়ালার পায়ে সব সপে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চায়। তার দুচোখ বেয়ে জল গড়ায়। হুসেন

খাঁ বললেন' 'চল বেরিলি, আমার গুরুজীর কাছে। তিনি মস্ত সাধু।'

সর্ব ত্যাগী আলম। তার বেহালা, সরোদ, ক্লারিওনেট সব পেছনে ফেলে চলল বেরিলি। সব শুনে সাধুজী বললেন, "আরে, তোর ঈশ্বর তো ঐ সঙ্গীত। সঙ্গীতেই তোর মুক্তি। তুই ফিরে যা।"

গুরুর চরনে ঠাঁই হল না আলমের।

আবার ফিরে এল রামপুরে। সঙ্গীতের দুয়ারে অভিশপ্ত প্রহরী। মহম্মদ হুসেন খাঁ-ও ওয়াজীর খাঁ-র কাছে তালিম পেয়েছেন। তিনি ভাল করে জানেন ঐ আকাশ চুম্বি দম্ভে কোন দিনও চিড় ধরবে না। আলাউদ্দিন তার নাগাল পাবে না কোন দিনও। হুসেন খাঁ বললেন, "তুমি সাধক, আমার গুরু ভাই। আমি তোমাকে বীণা শেখাব।"

আলম উদ্গত অশ্রু সম্বরণ করে মহম্মদ হুসেন খা বীণকারের শিষ্যত্ব গ্রহণ করল। এমনি করে বিতিয়ে গেল দুটি বছর, তিনটি মাস।

॥ তিন ॥

শিবপুরের দিন গুলিও গড়িয়ে যায়। নিস্তরঙ্গ। কিন্তু হঠাৎ একদিন তরঙ্গ উঠল মদিনাকে কেন্দ্র করে। সে এখন পূর্ণ যৌবনা। তন্বী। আলমের দুই দাদা বিবাহিত। বাড়িতে তিন বৌ। একদিন তিন বৌ চলেছে গাঁয়ের পথে। গাঁয়ের দুই বায়ুণ্ডুলে বদমায়েশ হাসি মস্করা করল। তাদের ইঙ্গিত ঐ মদিনাকে ঘিরেই। আরো কয়েকদিন এই দৃশ্য নজরে পড়ল। ক্রমেই গুঞ্জন উঠল।

বড় বৌ তার স্বামীকে বললে, "এর একটা বিহিত করতেই হবে।"

সফদর হুসেন খাঁ-র ব্যাটার বৌ-এর দিকে কুদৃষ্টি। গ্রামবাসীরা উত্তেজিত হয়ে সেই বায়ুণ্ডুলে দু'টিকে ধরে আনল। পঞ্চায়েৎ বসলে। তাদের নাকে কানে খত দিয়ে দূর করে দেওয়া হল গ্রাম থেকে।

লজ্জায় ক্ষোভে মদিনা ভেঙে পড়ল। তার দেহে কুদৃষ্টি পড়েছে। অপবিত্র হয়েছে। কলঙ্কিনী। সন্ধ্যায় ঢেকি ঘরে ঢুকে উদখলের ওপর দাঁড়িয়ে আড়াআড়ি বাঁশের সঙ্গে ফাঁসের রসি বাঁধল। হাত পা কাঁপছে থরথর করে। আর কয়েক মূহূর্ত পরেই সব শেষ।

*　　*　　*

সেদিনও আলম গুরুর দুয়ার থেকে ফিরেছে দুপুরে। শ্রান্ত অবসন্ন দেহ। ডালে-চালে সেদ্ধ করে খেতে খেতে বেলা গড়িয়ে গেছে। এমন সময় ওয়াজীর খাঁর মেজ ছেলে এল হন্তদন্ত হয়ে, "বাঙালী বাবু, শিগ্‌গীর এসো। আব্বাজান ডাকছে।"

ওরা দু'জনে ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হল। ওয়াজীর খাঁ-র মুখ থমথম করছে। হাতে এক টুকরো কাগজ। ধুকপুক করছে আলমের বুক। ওয়াজীর খাঁ শুধালেন, "তোমার বাড়ীতে কে কে আছে?"

আলম আনত মুখে সবিস্তারে বলল। ওয়াজীর খাঁ এই প্রথম সরাসরি কথা বললেন আলমের সঙ্গে।

"তুমি সাদি করেছ?"

"হু, আমার বয়স যখন এক।"

"কি বলছ?"

"আমার পরিবার তখনো জন্মায়নি।" আলমের সলজ্জ জবাব।

"তবে কি রকম সাদি?"

"বাপের দোস্তের কন্যা। জন্মাবার আগেই ঠিক হয়েছিল।"

ওয়াজীর খাঁ-র মুখে বিষাদের ছায়া, "তোমার বিবি নিজের জান খতম করতে চাইছে। তোমার দেশ থেকে তার এসেছে। তুমি জল্‌দি ঘর যাও।"

আলম নিরুত্তর। সবাই চুপচাপ। ওয়াজীর খাঁ-র কণ্ঠে সহানুভূতির সুর বাজে, "কিছু বলবে?"

এই একটু মিষ্টি কথার ছোঁয়ায় আলমের চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসে, "এই ছ'বছর ছ'মাসে কিছুই শিখতে পেলাম না। ঘরে গিয়ে এ পোড়া মুখ দেখামু কি কইরা!"

কেন? কেন? ওয়াজীর খাঁ শশব্যস্ত হয়ে উঠলেন। চোখের জলের ঘায়ে হিমালয়ের ঘুম ভাঙল। ছেলেদের বললেন, "আমি এই বাঙালী বাবুর হাতে নাড়া বেঁধেছি। তোমরা শেখালে না কেন?"

"আপনার ইজাজত পাই নি।"

"কিছু না পেয়েই রোজ এখানে এসে হাজিরা দিত!" করুণা মিশ্রিত বিস্ময় ওয়াজীর খাঁ-র কণ্ঠে। আলম তেমনি চোখের জলে নীরব।

"পিয়ারা মিঞা, মজ্‌লা সাহেব, ছোটা সাহেব"—ছেলেদের নাম ধরে ধরে বললেন ওয়াজীর খাঁ, "আজ থেকে আলাউদ্দিন তোমাদের ভাই হল। তোমাদের সব বিদ্যা ওকে শেখাও। আমিও শেখাব।"

॥ চার ॥

কি দিন, কি রাত। ক' ঘণ্টা হল। দশ ঘণ্টা? বার ঘণ্টা? চোদ্দ ঘণ্টা? বাজিয়ে চলেছে আলম। আলাউদ্দিন খাঁ। সে এক উন্মত্ত অবস্থা। এক গণ্ডুষে যেন মেটাবে সমুদ্র তৃষ্ণা। অপটু দেহটা যেন বিকারের ঘোরে পেয়েছে দানবের শক্তি। এই দানবটাকে আলম শাসায়, "অনেক যন্ত্রণা সয়ে তোকে বাঁচাইয়া রাখছি। এখন ঠিকমত না চললে তোকে কোন বাপে রক্ষা করবে?" অশ্লীল গালাগাল করে। অর্শের ক্ষত থেকে রক্ত চুইয়ে চুইয়ে পড়ে। বেশ কিছুদিন হলই সুরু হয়েছে এই নতুন উপসর্গ।

আলম সৈনিকদের ক্লাবে ব্যাণ্ড বাজনা ছেড়ে দিল। হোক সে কপর্দক শূন্য। জীবনে ক্ষয়ে যাওয়া সময় এখন তার বড় প্রয়োজন। হায়! হায়! খাইতে নাইতেই দিন গেল। আহার নিদ্রা চার ঘণ্টায় সীমিত করল। গুরু খিদমতের জন্যে চার ঘণ্টা। জুতো, পানদানী, গড়গড়া, মেডেল -নিত্য ঘষে মেজে চকচকে করে রাখে। পিক ফেলতে চাইলে পিকদানী এগিয়ে ধরে, কলকের আগুন পালটায়. বৈঠকখানার দ্বারে তটস্থ দাঁড়িয়ে থাকে সামান্য ইঙ্গিতের অপেক্ষায়

আর একটি ঘণ্টাও গেল। মহম্মদ হুসেন খাঁ এবার ওস্তাদ ওয়াজীর খাঁ-র অনুমতি নিয়ে আলমকে ভর্তি করে নিলেন ব্যাণ্ডে। বেহালা বাজাবে। মাসিক বেতন পাবে দরবার থেকে। বিকেল চারটার আগে সে সরোদ নিয়ে বসতে পারে না। রেওয়াজ চলে ভোর চারটা পর্যন্ত। আলম আরো এগুতে চায়। কোন কোন দিন চব্বিশ ঘণ্টায় চোখের পাতা এক হয় না।

আহারের চিন্তা নেই। সেইদিন থেকে গুরু গৃহে দুপুরের নিত্য পাত পড়ে। সকালে ছোলা। ওয়াজীর খাঁ বলেন, "আলাউদ্দিন

গোস্ত খা বেশী করে। সকালে গোস্ত দিয়ে নাস্তা করে তান ধর. দেখবি গলা কি রকম খোলে।"

ঘোর উন্মত্ততায় চারটি বছর অতিবাহিত হবার পর একদিন এই গোস্ত খাওয়া নিয়েই এক অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে যায় নবাব দরবারের যন্ত্রীদের সঙ্গে। তারা গোস্ত খায়, তাদের দেহ পোক্ত। মাছের পানি খাওয়া এই বাঙালী বাবুটিকে নিয়ে তাদের হাসি মস্করা। এই যন্ত্র ধরবার মত তাগত আছে কি? এ নিয়ে গুরু ভ্রাতারাও পরিহাস করেন। সেদিন সেই বিনম্র বাঙালী একেবারে ক্ষেপে উঠল। বললে, "তোমরা যা বাজাও তা আমি এই বাম হাতে বাজাবার পারি।"

সত্যি সত্যি আলম সরোদ ঘুরিয়ে ধরল বাঁ হাতে। প্রতিজ্ঞা রাখল। দরবারের যন্ত্রীরা চুপ। তাদের কল্পনার অতীত। লোক চক্ষুর অন্তরালে কখন আলম আর সরোদ একাত্ম হয়ে গেছে! আলাউদ্দিন আর সরোদ সমার্থ। সেই থেকে আলম তারের যন্ত্র বাজায় বাঁ হাতে। ডান হাতে বাজায় চাম্‌ড়ার বাদ্য।

আলমের খিদমতে ওয়াজীর খাঁ খুশি। তিনিও এখন মাঝে মধ্যে নিজ হাতে সরোদের তালিম দেন, কণ্ঠে শেখান ধ্রুপদ। হামিদ মঞ্জিলে ওয়াজীর খাঁ-র নাটক অনুষ্ঠিত হলে আলমকে সেখানে যন্ত্র বাজাতে হয়।

ইতিমধ্যে এই পৃথিবীটাকে ভাগাভাগি করে নেবার জন্যে কোথায় যেন উন্মত্ত যুদ্ধ সুরু হল। তার ঢেউ এসে এই ক্ষুদ্র রাজ্যেও লাগে। রামপুরের ব্যাণ্ডের কেউ কেউ সৈনিকদের ব্যাণ্ডে যোগ দিয়ে দেশ ছাড়া হয়। এই জগতের সংঘাত, উত্তাল ঢেউ আলমের জীবনে নিথর। তার দ্বন্দ্ব, ইচ্ছা আর শক্তির মধ্যে। বিরামহীন অতন্দ্র একাগ্রতা তার স্নায়ুকে যেন ছিঁড়ে খুঁড়ে খায়। অদ্ভুত অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটতে থাকে।

॥ পাঁচ ॥

সেদিনও আলম বাজিয়ে চলেছে। রাত ভোর হয় হয়। পাখি ডাকছে। নিমীলিত আঁখি। তন্ময়। হঠাৎ আলোর আভাসে চোখ মেলে দেখল চৌকাঠে দাঁড়িয়ে আছে আলখাল্লা পরিহিত দীর্ঘদেহী এক সৌম্য মূর্তি। সোনার বরণ। লম্বা দাড়ি, চুল। আলম যন্ত্র নামিয়ে আদাব জানাল। অতিথি আশীর্বাদ করে বললেন, "সারারাতই তোমার বাজনা আমাকে টানে। এইবার হদিস পেয়ে একেবারে তোমার সামনে এসে দাঁড়ালেম। তোমার বাজনাটা দেখছি রবাবের মত। ভারি মিষ্টি ওর আওয়াজ। আমি আরো শুনতে চাই, তুমি আরো একটু বাজাও।"

আলম শশব্যস্ত হয়ে ফকিরকে এনে বসালে। এবার ধরল ভৈরবের আলাপ। ঘণ্টা খানেক বাজাল। ফকির ধ্যানস্থ হয়ে শুনলেন। তার মুখে তৃপ্তির ব্যাঞ্জনা। চোখ খুলে বললেন, "এ যন্ত্রের বাজনা আমি আগে শুনিনি। ইচ্ছা হচ্ছে খাঁ সাহেবের কাছে কিছুদিন থেকে যাই। আমার আহারের জন্যে কিছু করতে হবে না। এখন একটু চা হলেই হল। আমি সপ্তাহে দু'দিন খাই। তাও দু'খানা রুটি।" কথার মধ্যে ফকির সাহেব আলমের আসনের দিকে চেয়ে বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, "ও কিয়া চিজ ?"

আলমও দেখল সে যে মাদুরে বসে আছে তা কেমন ভেজা ভেজা। বেশ খানিকটা জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে কাল দাগ। তারপর হাত দিয়ে টিপে বুঝে বললে, "ও কুছ নেহি। অর্শের রক্ত।"

আলম ফকিরকে কিভাবে যত্নআত্তি করবে দিশা পায় না। সঙ্গীত সাধক ফকির দাদা আফতাবউদ্দিনের কথা মনে পড়ে। সেও তো এমনি ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, দেশে দেশে। মনটা উদাস হয়ে

যায়। একটা উদ্বেল আবেগে ফকিরকে বলে, "আপনি যতদিন ইচ্ছা থাকুন। আমিই খিদমত করে ধন্য হব।"

ফকির থেকে যান কিছু দিন।

কথাটা এক কান থেকে আর এক কানে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। রামপুরের গণ্যমান্য ব্যক্তি, বিখ্যাত গায়ক-বাদকরা একে একে ভীড় করতে লাগল আলমের গৃহে, ফকির দর্শনে। রহস্যটা জানা গেল পরে। কি করে গোপন সূত্রে রাষ্ট হয়ে গেছে, এ ফকির সোনা তৈরীর মন্ত্র জানে। ফকির সাহেব যত অস্বীকার করেন ততই বিপত্তি বাড়ে। গণ্যমান্য বুদ্ধিমানরা ভাবেন ওটা বিনয়। ধৈর্য্য রেখে একটু চেপে ধরলেই বলবেন। ক্রমে ফকির সাহেবের ওপর চাপ বেড়েই চলে। গণ্যমান্যদের মধ্যে চলে নির্লজ্জ হানাহানি। ধনীর কাঙালপনায় আলম বিরক্ত হয়ে ওঠে। ফকির সাহেবও অতিষ্ঠ।

সেদিনও আলম বাজাচ্ছে। রাত দ্বিপ্রহর। ফকির সাহেব এখনো ফিরলেন না। ভেতরে ভেতরে কেমন উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল আলম। বাজনায় মন বসছে না। রামপুরের স্বর্ণলোভাতুররা ফকির সাহেবকে গুম করে ফেলেনি তো! কথাটা মনে হতেই আলম বাজনা থামিয়ে বেরিয়ে পড়ল পথে। সারারাত ধরে খুঁজে বেড়াল রামপুরের এদিক ঐদিক সেই দিক। একটা অস্বস্তির মধ্যে রাত পোহাল।

এক দুই করে সাত দিন কেটে গেল। রাত্রিও শেষ হয়ে এল। আলোর আভাসে আলম বাজনা থামিয়ে নিমীলিত চোখ খুলে দেখল, সেই প্রথম দিনের মতই ফকির সাহেব দুয়ারে দাঁড়িয়ে। এই শীতের সকালেও তার আলখাল্লা থেকে টপ্ টপ্ করে জল পড়ছে। সর্বাঙ্গ শিক্ত।

আলম ব্যস্তসমস্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল তার সেবায়। কোন কথা

বলার আগেই ফকির সাহেব হাতের ইঙ্গিতে তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "তোমার সেবায় আমি বহুৎ খুশি। সাতদিন তমসার জলে দাঁড়িয়ে তোমার মঙ্গলের জন্মে আমি প্রার্থনা করেছি। শনিবার দিন ধুনো জ্বেলে এই মাতুলিটা ধারণ করবে।" তারপর ঘরের চার দিক দেখে শুনে বললেন, "সের দশেক কাঠ কয়লা এনে দিতে পার ? আমার শেষ কাজ এখনো বাকি।"

আলম ছুটে বেরিয়ে গেল। কাঠ কয়লা যোগার করা খুব কঠিন হল না। ফিরে এলে ফকির সাহেব বললেন, "দরজায় খিল এটে দাও, কেউ না আসে।"

ফকিব সাহেব ঝোলা থেকে কি সব রাসায়নিক জিনিসপত্র বের করতে লাগলেন। দেড় ফুট লম্বা একটা লোহার পাইপ বেরুল। তার মধ্যে ঐ রাসায়নিক পদার্থগুলি ঠেসে ঠেসে ভরলেন। তারপরে ঘরের মেঝেতে কাঠ কয়লায় আগুন ধরিয়ে ঐ লোহার পাইপটা ঠুসে দিতে লাগলেন। চার ঘণ্টা অতিবাহিত হয়ে গেল। আলম রুদ্ধ—শ্বাসে বিস্ফারিত নেত্রে দেখছে, ফকির সাহেবের চোখ দু'টি ধক্ ধক্ জ্বলছে, ধোঁয়ায় রক্তবর্ণ, মুখে বিড় বিড় করে কি সব বকছে! একটা অজানা আশঙ্কায় আলমের গা-টা শিরশির করতে লাগল। হঠাৎ একটা তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠল ফকির সাহেবের মুখে। ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে এল তার আদল। দীর্ঘশ্বাস টেনে বললেন, "রামপুরে সবাই আমাকে সোনার জন্মে পাগল করেছে; কিন্তু তুমি তো আমার কাছে কিছু চাওনি।" বলতে বলতে সেই লোহার পাইপকে মেঝেতে ঠোকাঠুকি করতে লাগলেন। ঠনাস্ করে একটা হলুদ বর্ণের পদার্থ ছিটকে পড়ল মেঝেতে।

"তুলে নাও।" ফকির সাহেব আদেশ করলেন। ভয়ে ভয়ে পদার্থটা হাতে তুলে নিয়ে আলম বলল, "আমি সুরের কাঙাল। সোনা নিয়ে কি করব ?"

"তোমার দরকার নেই। কিন্তু আমি ঋণ রেখে যেতে চাই না। আমি তোমার এখানে খেয়েছি, তার মূল্য ধরে নাও।" বলে ফকির সাহেব তার জিনিসপত্র ঝোলায় ভরে ত্রস্ত পদে প্রস্থান করলেন। আলম পদার্থটা হাতে নিয়ে হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ক্রমে সেই অজানা আশঙ্কাটা আবার তাকে ঘিরে ধরল। এ নিয়ে আমি কি করব? কাকে বলব? মানুষের সাক্ষাতে এলেই আতঙ্কে চম্‌কে চম্‌কে ওঠে। সবাই যেন তার ট্যাকের দিকে ইঙ্গিত করছে,—"হুঁ হুঁ, সবই জানা আছে হে বাপু, কে কত সাউগার।"

সন্ধ্যা পর্যন্ত আলম একেবারে অস্থির হয়ে উঠল। কোথায় যায়। কি করে। হঠাৎ মনে পড়ল সুন্দরলালের কথা। আলমের কাছে তবলা শেখে। রামপুর বাজারে তার স্যাকরার দোকান। শেষ পর্যন্ত তার হাতে পদার্থটা তুলে দিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফলল, 'যা হয় হোক!"

সুন্দরলাল পদার্থটা হাতে নিয়ে কষ্টি পাথরে ঘষে বললে, "আ! ই তো আস্‌লি সোনা।"

আলম সোনার হাত থেকে বাঁচল বটে, কিন্তু মাদুলির হাত থেকে বুঝি বাঁচে না। মধ্য রাত্রি। আলম সরোদ বাজাচ্ছে, হঠাৎ মনে হল ঘরের দেয়ালটা যেন সরে গেছে। খোলা আকাশের আলো এসে পড়েছে ঘরে। বাইরের স্তম্ভ দুটি ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। ক্রমে তা বড় হতে লাগল। আকাশে ঠেকা লাগছে। কেমন মোচড় দিয়ে ভেঙে পড়বে। আলম ভয়ে শিটিয়ে গেল। লাফ দিয়ে উঠে আপাদমস্তক লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল।

একি স্নায়ু বৈকল্য। আলম নিজেকে চিমটি দিয়ে দেখে না, চেতন তো ঠিকই আছে। সে শুনতে পাচ্ছে ঘরের মধ্যে কারা যেন চলাফেরা করছে। ফিস্‌ ফিস্‌ করে কথা কইছে।

আলম লেপের মধ্যে ঘেমে উঠল। আস্তে আস্তে লেপটা মুখ থেকে সরিয়ে যা দেখল তাতে গায়ের রক্ত হিম হয়ে গেল। সাদা আলখাল্লা পরা পাকা লম্বা দাড়ি, ফর্সা শীর্ণ প্রাণ হীন মুখ, দু পাশে দু'জন কুনুই-এর ওপর ভর দিয়ে স্থির দৃষ্টি মেলে আলমের মুখের দিকে চেয়ে আছে। আলম চোখ বন্ধ করে লেপ টেনে দিল। ভেতরে থর থর করে কাঁপছে। ঘেমে নেয়ে গেল। সব কিছু যেন তালগোল পাকিয়ে তলিয়ে গেল। ভোর বেলা জ্ঞান ফিরে এলে দেখল ঘরের সবকিছু ঠিক আছে। দুয়ারের খিলও তেমনি দেওয়া আছে।

পরের দিন রাত্রেও সেই একই দৃশ্য। সেই বিভীষিকা। একটা অনির্দ্দেশ্য অস্বস্তি আলমকে ঘিরে থাকল সারাক্ষণ। আচ্ছন্নের মত তার চলাফেরা। মনঃসংযোগ নষ্ট করে দিতে লাগল। রেওয়াজে ব্যাঘাত ঘটতে লাগল বার বার। সাত দিনের দিন সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই আলম চলে গেল তমসার তীরে। ফকিরের দেওয়া মাদুলিটা খুলে ফেলে দিল তমসার জলে। মুহূর্তে দেহটা কেমন ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পড়ল। কোন মতে ঘরে ফিরেই গভীর নিদ্রায় ডুবে গেল। ঘুম যখন ভাঙল, তখন রাত গিয়ে দিনও শেষ হয়ে গেছে।

তারপর থেকে আলম আর সেই দৃশ্য দেখেনি। একদিন ওয়াজীর খাঁ-কে এই কাহিনী বলাতে তিনি বললেন, "আরে বেকুফ। তুই পেয়ে হারালি। মাদুলিটা আমায় দিলি না কেন। ও দু'টোকে যা হুকুম করতাম তাই তালিম করত।"

* * *

যুদ্ধ শেষ। ইংরেজরা জয়ী হয়েছে। হামিদ মঞ্জিলে বাজি পুড়ল। মিঠাই বিতরণ হল। ভারতবর্ষ পেল জালিওয়ানাবাগ। গণ-হত্যা। তমসার জলে মাদুলি নিক্ষেপের মত সামান্য তরঙ্গাঘাত

ভিন্ন বড় কিছু ঘটল না রামপুরবাসীর জীবনে। আলম তার সঞ্চিত অর্থ দিয়ে একটা ফৌজী কোট কিনে ফেলল। বার বছর পুর্ণ হল ওয়াজীর খাঁ-র কাছে।

॥ ছয় ॥

"শিক্ষা দীক্ষা পরীক্ষা—এই তিনে মিলে বিদ্যা।" একদিন শরতের সকালে আলম নত হয়ে যথারীতি জুতো জোড়া এগিয়ে দেবার সময় ওয়াজীর খাঁ তার পিঠের ওপর হাত রেখে বললেন, "তোমার শিক্ষা দীক্ষা সমাপ্ত। এবার দেশ ভ্রমণ কর। গুনীদের বাজনা শোন, বাজনা শোনাও। এবার পরীক্ষা।"

কলকাতার শ্যামলাল ক্ষেত্রী। গণপত রাওয়ের শিষ্য। সঙ্গীত শিল্পী হিসাবে তার খ্যাতি না থাকলেও শিল্পীর সহায় হিসাবে সকলের শ্রদ্ধার পাত্র। তিনি ব্যবসায়ী হয়েও সঙ্গীতের রসিক সমজদার। শ্যামলাল ক্ষেত্রীই আবিষ্কার করলেন রামপুর থেকে সদ্য আগত সরোদীয়া আলাউদ্দিন খাঁ-কে। হেদুয়ার কাছে, পুটিয়ার রানীর বাড়ীতে। এ বাড়ীর অতিথিশালা বহু গুণী শিল্পীর আশ্রয়স্থল। বীণকার লছমী প্রসাদ, এমদাদ খাঁ, বিশ্বনাথ রাও প্রভৃতি অনেকেই আশ্রয় পেয়েছেন এখানে।

মনে হয় স্বপ্নের মত। বহু যুগ আগে আলাউদ্দিনও থেকে গেছে এ বাড়ীতে। মহম্মদ আলির সাগ্‌রেদ হয়ে। তখন ছিল আলম। এখন আলাউদ্দিন। এ কলকাতা তার কাছে অপরিচিত। ধূসর। জীবিকার সংঘাতে অস্থির। আলাউদ্দিনের সরোদ শুনে লছমী প্রসাদ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন, "এ বীনকারের তালিম। ভারতবর্ষে নতুন জিনিস। তুমি এ বিদ্যা প্রচার কর।"

"কোথায় বাজাব? কে শুনবে? আলাউদ্দিন বিমর্ষ। পূর্ব পরিচিত কেউ নেই। তার বংশ সঙ্গীত জগতের পথ সুগম করে যায়নি। কোথায় যাবে! এবার কোথায় পালাবে! একে একে যেন সব পথ বন্ধ হয়ে এল। আবার কপর্দক শূন্য। এই সময় শিল্পী বন্ধু শ্যামলাল ক্ষেত্রী এলেন ত্রাতা রূপে। ভবানীপুরে সঙ্গীত সম্মেলন হচ্ছে, আলাউদ্দিন আমন্ত্রণ পেল বাজাবার।

বিশিষ্টদের ভীড়ে আলাউদ্দিনকে কেউ লক্ষ্যই করল না। নামি বড় বড় ওস্তাদদের নিয়ে সবাই ব্যস্ত। ফৌজি কোট, রামপুরী পায়জামা পরে আর গোফ পাকিয়ে প্রায় সকাল থেকেই সে প্রস্তুত হয়ে রইল। কেউ ডাকে না। এর কাছে যায়, ওর কাছে যায়। একজন কর্মকর্তা তো বলেই ফেললেন, "তুমিও বাজাবে নাকি?"

শেষ পর্যন্ত আলাউদ্দিনের ডাক পড়ল। শ্রোতারা ভেবেছিলেন রামপুরের কোন উদিয়মান সরোদ তারকাকে দেখতে পাবে মঞ্চে। দেখলে আলমকে। ভেতো আলাউদ্দিন খাঁ। তবলচি দর্শন সিং-এর পোষাকও এর চেয়ে শতগুনে ভাল।

আমন্ত্রিতদের আসনে রাজা মনীন্দ্র চন্দ্র নন্দীর মত তাবত তাবত ব্যক্তিরা বসে আছেন। আলাউদ্দিনের মনে হতে লাগল চারদিকে নির্মম উপেক্ষার ভ্রূকুটি। তানপুরায় সুর বেঁধে গুরুর নাম স্মরণ করে সরোদে তান মারলে। সবাই সচকিত হয়ে নড়েচড়ে বসল। "না, গুন আছে।"

পুরীয়া রাগে বিলম্বিত আলাপ চলল আধ ঘণ্টা ধরে। সমস্ত গুঞ্জন থেমে গেল। নিস্তব্ধ চারদিক। অভিভূত শ্রোতৃমণ্ডলী। 'বাহবা' দিতেও ভুলে গেল।

সবাইকে সেলাম জানিয়ে এবার ধরলে গৎ, জোর, ঝালা। ছন্দে লয়ে তানে মাতিয়ে দিলে আসর। ধ্রুপদের অঙ্গে বাঁধা সরোদ। হিমালয়ের প্রশান্তি। নিঃস্তরঙ্গ সমুদ্রের গভীরে উত্তাল

ঢেউ। তীরে এসে ভেঙে পড়ছে পরম উল্লাসে। কখন বা উঠছে ঝড়ের আবেগ। দর্শন সিং অচিরেই বেদম হয়ে পড়ল। বসল এসে নতুন তবলচি। সভাসুদ্ধ সবাই মন্ত্রমুগ্ধ। চার ঘণ্টা কোথা দিয়ে চলে গেল।

তারপরের দিনই শ্যামলাল ক্ষেত্রী আলাউদ্দিনকে বললেন, "আপনি মাইহার যাবেন? মাইহারের রাজা ব্রজনাথ সিংজী আমার বন্ধু। উনি একজন প্রকৃত ওস্তাদের খোঁজ করছেন।"

আলাউদ্দিন সম্মত হল। কিন্তু রেস্ত নাই। কলকাতায় এসে চরম আর্থিক শঙ্কটে পড়েছে। শ্যামলাল ক্ষেত্রী বুঝে বললেন, "যানতো আজই রওনা দিন। আমি তার করে দিচ্ছি।"

শ্যামলাল ক্ষেত্রীই মাইহার যাবার সব ব্যবস্থা করে দিলেন। আবার দেশ ছাড়া। খ্যাপা খুঁজে ফেরে পরশ পাথর। সে নিজেও জানতে পারে না তার হাতের লোহাটা কখন সোনা হয়ে গেছে। খ্যাপার মত খোঁজাই তার জীবন।

॥ সাত ॥

মাইহার। পরীক্ষা রাজার সামনে। নবীন যুবক। মাত্র এক বছর হয়েছে সিংহাসনে বসেছেন। বিকেল পাঁচটা। যন্ত্র বেঁধে শ্রীরাগ ধরল আলাউদ্দিন। পাঁচ মিনিট না যেতেই রাজা এদিক চায়, ওদিক চায়। তার পরেই ইঙ্গিতে বাজনা থামাতে বলে উঠে পড়লেন। "আরাম কিজিয়ে," বলে নিজে আসর ছেড়ে চলে গেলেন অন্তঃপুরে।

আলাউদ্দিন হতবাক। প্রথম পরীক্ষার অভিজ্ঞতায় মনটা একেবারে দমে গেল। কোন বেকুফের কাছে এসেছে পরীক্ষা

দিতে। সন্ধিপ্রকাশ এই শ্রীরাগ। আলাউদ্দিনের গর্ব, অতি প্রিয়। রাত আটটায় আবার ডাক পড়ল। রাজ আদেশ। তাই যেতে হল। বিমুখ হয়ে রইল তার অন্তর আত্মা।

মস্ত বড় হল ঘর। চল্লিশের অধিক দেশী বিদেশী বাদ্য যন্ত্র থরে থরে সাজান রয়েছে। আলাউদ্দিনের কাছে কোনটাই অপরিচিত নয়। হাবুদত্তকে মনে মনে প্রণাম জানাল। দেওয়ান বললেন, "বাজান"। শ্রীরাগে যার বিরাগ তাকে কি শোনাবে। একটা ক্ল্যারিওনেট তুলে নিয়ে থিয়েটারের হাল্‌কা সুর ধরল, "লেও প্যালা ভর সকীয়া—" দু'মিনিট না যেতেই রাজা হুকুম দিলেন, "বন্ধ করো"। বড় হর্ণ এনে দিল—সুরু হল পঁ পঁ পঁ ভঁ— আর সঙ্গে সঙ্গেই "বন্ধ করো"। যাই বাজায়—সাগাপাসা সাগারেসা—লালালা টুক লালা—রাজা বলেন, "বন্ধ করো"। ঢোল থেকে মৃদঙ্গ, এক তারা থেকে সুরবাহার সবই শেষ হল। এক মিনিট যেতে না যেতেই রব ওঠে "বন্ধ করো।" দু'ঘণ্টায় প্রায় চল্লিশ রকমের বাদ্য বাজাতে হল আলাউদ্দিনকে। এবার কণ্ঠ সঙ্গীতের পালা। তাও পাঁচ সাত মিনিটের বেশি এগুতে পারল না।

"বন্ধ করো।" স্মিত হাস্যে মহারাজা এগিয়ে এলেন আলাউদ্দিনের কাছে। "আমার প্রতিজ্ঞা ছিল যে এই সমস্ত বাদ্য বাজাতে পারবে তাকেই এই রাজ্যের সভা গায়ক হিসাবে বরণ করব। আজ খুঁজে পেলাম।"

দেওয়ানজীর ওপর হুকুম হল। গুরুজীর থাকা-খাওয়ার যেন সুবন্দোবস্ত হয়। দরবারের উপযুক্ত পোষাক যেন থাকে। জড়োয়া পাগ্‌রি থাকবে মাথায়। সভা গায়কের উপযুক্ত সম্মান যেন রক্ষিত হয়। কাল দশহারা! শুভদিন! কালই অভিষেক।

দরবারের চাকচক্যের মধ্যে নিজেকে মনে হল বে-মানান।

জংলী। চন্দন চৌবের শিষ্য মথুরার ঘোররে মহারাজ তখন ছিলেন মাইহারে। তিনি আলাউদ্দিনকে বেঁধেছেদে দরবারের উপযুক্ত করে দিলেন।

মাইহারের দরবার। ছোট্ট রাজ্য। প্রজাসমাগমে দরবার কক্ষ পূর্ণ। পঞ্চাশ জন সর্দার উন্মুক্ত অসি নিয়ে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার মধ্যে বেটেখাটো বাঙালীবাবু আলাউদ্দিন খাঁ। পুষ্প চন্দনের সঙ্গে একথালা মহোর দিয়ে অভ্যর্থনা করলেন স্বয়ং মহারাজ। হাত ধরে একটা শূণ্য আসনে বসিয়ে দিয়ে বললেন, "এই রাজ্যে মহামন্ত্রীর পরেই গুরুজীর স্থান। আজ দশহারা। আমার বহুদিনের ইচ্ছা, সঙ্গীত চর্চা করি, ওস্তাদ রাখি। ওনার গান শুনে আমার দেহে শিহরণ সৃষ্টি হয়েছে। এ জিনিস আগে কখনো শুনিনি। যা চেয়েছি, আজ তার বেশি পেয়েছি। আপনারাও একে গুরু বলে সম্মান করবেন।"

প্রজারা হাত তুলে মহারাজার জয়ধ্বনি করে উঠল। হাঁ, গুণীর কদর জানেন আমাদের মহারাজা। আলাউদ্দিন খাঁ-কে গুরু বলে স্বীকার করে নিলে। রাজার গুরু, প্রজার গুরু।

একে একে দরবার কক্ষ ফাঁকা হলে আলাউদ্দিন করজোড়ে বলল, "মহারাজ, গুস্তাকি মাপ করবেন। আমি এখনো শিষ্য। আমার দেশ ভ্রমণের অধিকার আছে। গুরু হবার আদেশ পাইনি। আমি আপনার হাতে 'নাড়া' বাঁধতে পারব না।"

"আপনাকে গুরু না বলতে পারি, দাদা বলব।" মহারাজ বললেন, "আমি চাইলে ওস্তাদ ওয়াজীর খাঁ না করবেন না।"

পরদিনই দেওয়ানজীকে পাঠালেন রামপুরে। ওয়াজীর খাঁ মহাখুশি। তার শিষ্যকে দু'হাত তুলে আশীর্বাদ জানালেন। নিজ হাতে 'নাড়া' তৈরি করে দিলেন মহারাজের জন্যে। গুরু হলেন আলাউদ্দিন। কিন্তু গুরু দক্ষিণা!

"না, সে হবে না।" আলাউদ্দিন মাথা নাড়তে লাগল। তার ছোট চোখ দু'টি ছলছল করে উঠল। এই বিদ্যা অর্জনের জন্যে সারাজীবন সে অর্থকষ্ট ভোগ করেছে। দু'বেলা পেটপুরে খেতেও পারেনি। "সঙ্গীতের বিনিময়ে আমি অর্থ নিতে পারব না। একটা পানও খাব না। এই আমার প্রতিজ্ঞা। যে সত্যিকারে শিখতে চাইবে তাকে আমি এমনেই দিমু।"

"তা হলে আপনার চলবে কি করে?" মহারাজা একটু ভেবে নিয়ে বললেন, "বেশ আজ থেকে আপনি আমার দেবত্তর সম্পত্তির ম্যানেজার হলেন। মাইনে পাবেন দেড়শ টাকা। আমার রাজ্য ছোট্ট। তবু আমার বহুদিনের সখ আপনার মত একজন গুরু পাই। আমাকে বিমুখ করবেন না। ম্যানেজার হিসেবে একটা বাড়ি আপনার প্রাপ্য। গুরুমাতাকে এখানে নিয়ে এসে স্থির হয়ে বসুন। আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এখানে কিছুই হবে না।"

মদিনা—মদন মঞ্জরী। আলমের কোন সুদূরের ভুলে যাওয়া স্বপ্ন। আলাউদ্দিনের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত। চিঠি গেল শিবপুর গ্রামে। একদিন দাদা আফত্তাবউদ্দিন মদিনাকে নিয়ে উপস্থিত হলেন মাইহারে। পঁচিশ বছর, কি ত্রিশ বছর? হিসাবে ভুল হয়ে যায়। সেই নলোক পরা বালিকা বধূ। আলাউদ্দিনের সামনে বাংলাদেশের চোখ জুড়ান শ্যামলীমা! লাউ-এর ডগার মত ঢলপলে। সেদিনের মদিনা-আলাউদ্দিনের মিলনের সাক্ষী কেউ বেঁচে নেই। পরবর্তিকালে এ প্রসঙ্গে গুরুমাতাকে শুধালে তিনি ফিক্ করে হেসে ঘোমটা টেনে দেন। জবাব পাওয়া যায় না।

।। আট ।।

আলাউদ্দিনের চোখ দু'টি কৌতুকে চিকমিক করে ওঠে। "আরে ওনার টাকা মাইরাইতো আমার যত ফুটানি। বেহালা কিনছি, ক্ল্যারিওনেট কিনছি। ওনার কথা শুনেই গুরু আমাকে কৃপা করছেন। নইলে থাঁড়াইয়া থাঁড়াইয়াই জীবন যাইত।"

তার বাড়ির দুয়ারে নিজে হাতেই আঁকাবাঁকা অক্ষরে লিখে দিয়েছিলেন, "মদিনা ভবন।" উদয়শঙ্করের সঙ্গে ইউরোপ ভ্রমণান্তে নতুন বাড়ি করেন। নিজের মনমত গড়ে তোলেন মদিনা ভবনকে। ভারতীয় সঙ্গীত জগতের তীর্থ ক্ষেত্র।

তবু মদিনার কথা উঠলে আলাউদ্দিনের কণ্ঠ ভারী হয়ে ওঠে। "সারা জীবনে কি দিছি। দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা। মন দুঃখে তিনবার আত্মঘাতীনী হতে গেছেন। আমি কাঙাল, ফকির। কি দিমু?"

তার চোখ জলে ভরে ওঠে। পড়ন্ত রোদ্রে দূর দিগন্তের দিকে চেয়ে নির্জনে তার কণ্ঠ বেজে ওঠে, "সুতে চন্দ্র বদনী"—মনের বেদনা নিংড়ে নিংড়ে এই গানের পদ, এ সুরের মূর্চ্ছনা। আলাউদ্দিনের দীর্ঘ সাধনায় না পাওয়ার আকুতি বিধৃত এই সুরে। ভারতীয় সঙ্গীত ধারায় আলাউদ্দিনের সৃষ্ট নতুন রাগ। নাম রেখেছেন, "মদন মঞ্জরী।" এই তার শেষ সম্বল, স্ত্রীকে দিয়ে গেছেন।

সেদিন ছিল হাটবার। আলাউদ্দিন নিজ হাতেই বাজার করেন। আর মাঝে মধ্যেই বাড়িতে এসে কেঁদে পড়েন। "হায়! হায়! এই ছাইভস্ম করেই দিন গেল। সঙ্গীতের স'টার লাগালও পেলাম না।"

পিওন এল চিঠি নিয়ে। ওস্তাদজীকে বাড়িতে না পেয়ে চিঠি নিয়ে চলল হাটে। তার চিঠি পেতে যেন কোন বিলম্ব না হয়।

আলাউদ্দিন চিঠি পড়ে স্তব্ধ হয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর ব্যস্ত হয়ে পিওনকে বললেন, "তুই বাড়িতে খবর দিয়ে যা আমি রামপুর গুরুর কাছে চললাম।"

ঐ হাট থেকেই একবস্ত্রে রওনা দিল রামপুর।

আলাউদ্দিনকে দেখে ওয়াজীর খাঁ কান্নায় ভেঙে পড়লেন। "তোমাকে আমি বহুৎ কষ্ট দিয়েছি। তার শাস্তি ওপরওয়ালা আমাকে দিলেন। বীনা রবাব সুরশৃঙ্গার তোমাকে আমি শেখাইনি। আমাদের ঘরের ধ্রুপদ-ধামারও তোমাকে দিইনি। কিন্তু সব শেষ। আমার ঘরের জিনিস আর কেউ রক্ষা করতে পারবে না। পিয়ারা মিঞা আর নেই। তাকেই আমি সব কিছু দিয়ে তৈরি করেছিলাম। আর ছেলেরা, নাতি নাত্‌নিরা সব ছোট ছোট। এখন একমাত্র তুমিই এ সম্পদ রক্ষা করতে পার। যে কষ্ট তুমি পেয়েছ তা পরকে শিখিয়ে কিছুটা লাঘব করতে পারবে। তোমাকে আমি সব কিছু দেব।"

গুরুও কাঁদে, শিষ্যও কাঁদে। মর্মস্পর্শী সে দৃশ্য।

"আমি হতভাগা। বয়সকালে গুরুর মেহেরবানি পাইনি। এখন আমার দাড়িতেও পাক ধরেছে। ক'ঘণ্টা রেওয়াজ করতে পারব? এ মানব জনম গেল বৃথা। আমি কান পাক্‌ড়াচ্ছি। আমাকে মাপ করুণ। আমি বীনার অপমান করতে পারব না।" আলাউদ্দিন গুরু সেবার জন্যে কিছুদিন থেকে গেলেন রামপুরে। চারদিকে শোকের ছায়া।

কয়েকদিনের মধ্যেই ওয়াজীর খাঁ-র বলিষ্ঠ দেহ একেবারে ভেঙে পড়ল। মাইহার থেকে আলাউদ্দিন নিয়মিত আসে যায়। গুরু সেবা করে। সেই দাম্ভিক পুরুষ বংশ গরিমায় উন্নাসিক, যেন মাটির মানুষ হয়ে যায়। পরিচয়হীন বাঙালী বাবুকে আঁকড়ে ধরে। উজার করে শেখাবার জন্যে ব্যাকুল হয়। দিন ঘনিয়ে

আসে, অবসন্ন গুরু। শ্রান্ত শিষ্য। সর্বস্ব দান করেও তৃপ্তি নেই। গ্রহন করেও আশ মেটে না। আস্তে আস্তে তানসেন বংশের অতৃপ্ত শেষ সূর্য অস্তমিত হল। বড় ছেলে মারা যাবার তিন বছর পরেই ওয়াজীর খাঁ দেহ রাখলেন তার ঘরণা রক্ষার মহা দুঃশ্চিন্তা মাথায় নিয়ে।

আলাউদ্দিন সঙ্গীতের বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা নিয়ে মৌন নত শিরে ফিরে এলেন মাইহারে, তার মদিনা ভবনে।

আভোগ

দেশ দেশান্তর

মধ্যপ্রাচ্য - ইওরোপ - শান্তিনিকেতন

॥ এক ॥

সামন্ত যুগের মধ্য গগনে উত্তর ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রধান ও শ্রেষ্ঠ শিল্পী মিঞা তানসেন বাঁধা পড়েছিলেন দিল্লীশ্বরের দরবারে। সশস্ত্র প্রহরী তার দুয়ারে। যে সাধারণ মানুষের মধ্যে তার জন্ম, তার সৃষ্টি, তার ফলশ্রুতি সীমিত আকবর বাদশার দরবারের চৌহদ্দির মধ্যে। বহু মূল্য রত্ন। সাধারণ মানুষ থেকে বহু দূরে। বিচ্ছিন্ন।

সামন্ত যুগে সৃষ্টির যা কিছু সুন্দর, যা কিছু শ্রেষ্ঠ, যা কিছু উপভোগ্য সবই সামন্ত প্রভুদের জন্যে। শিল্পীকে একান্ত করে নিগড়ে বেঁধে রাখার মধ্যেই তাদের গৌরব। এই বিচ্ছিন্নতা আর জীবিকার নিরাপত্তা—দুইএ মিলে সৃষ্টি করল "ঘরণা।"

মিঞা তানসেনের সৃষ্টি সাধারণ মানুষের উষ্ণ স্পর্শে সঞ্জীবিত হল না কোন দিনও। চার দেয়ালের মধ্যে বন্দী হয়ে রইল চারশ' বছর ধরে। ওয়াজীর খাঁ গর্ব করে বলতেন, মিঞা তানসেন তার মেয়েকে নিজ হাতে লিখিত যে সঙ্গীত গ্রন্থটি তার সাদিতে উপঢৌকন দিয়েছিলেন সেটি আজো তাদের সিন্দুকে রক্ষিত আছে। সেটি কাউকে দেবার বা দেখাবার অধিকার নেই। নিজেরাও কোন দিন খুলে দেখেননি। পাছে লোভ হয়, কাউকে দেখিয়ে ফেলেন। এমনি করেই রক্ষিত হয় "ঘরণা।"

মোগলদের পর ইংরেজ এসেছে। শোষণের নির্মম চাকা চলেছে। কিন্তু সামন্ততন্ত্রের কাঠামোকে ভাঙেনি। পঙ্গু করে আগলে রেখেছে। সেনী ঘরণাও প্রতিপালিত হয়ে এসেছে সামন্ততন্ত্রের কঠিন কঠোর পাষাণ পুরীর মধ্যে। মিঞা তানসেন থেকে ওয়াজীর খাঁ।

কিন্তু এই শতকে ভেতরে ভেতরে ভাঙন ধরেছে সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তিমূলে। সামন্ততন্ত্রের নিগড়ে। ব্যবসা ভিত্তিক সভ্যতা, বৈভব, ক্ষুন্ন করতে লাগল সিংহাসনের আভিজাত্যকে। ঘরণার প্রাচীরেও চিড় ধরল। একেবারে ধ্বসে পড়ল নসির খাঁ-র অকাল মৃত্যুতে।

সামন্ততন্ত্রের ভাঙনের যুগে সঙ্গীত ইতিহাসই সৃষ্টি করল এই ঐতিহাসিক পুরুষ আলাউদ্দিন খাঁ-কে। আগল ভেঙে ভগীরথের মত বয়ে নিয়ে এলেন সেনী ঘরণার ফল্গু ধারা। দু'হাতে ছড়িয়ে দিলেন চারদিকে। সেনী ঘরণার দুই প্রান্তে দুই মহান স্রষ্টা। দুই নাম। মিঞা তানসেন আর আলাউদ্দিন খাঁ। একজন সঙ্গীত সরস্বতীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ রাজ দরবারে উৎসর্গ করেছিলেন। স্বেচ্ছায় বন্দী। আর একজন তার বন্ধন মুক্তি ঘটালেন। যিনি শুধু অনুকরণে সীমিত নয়, সৃজনশীল প্রতিভায় উদ্ভাসিত।

*　　　*　　　*

তখন 'ডিরিডিরি' বোলে সরোদ বাজত। আলাউদ্দিনকে বিপথগামী করার জন্যে জনৈক গুরু 'ডারাডারা' বোলে বাজাবার নির্দ্দেশ দিলেন। গুরু জ্ঞানে সে আদেশ নিষ্ঠাভরে পালন করতে গিয়ে সরোদের নতুন পদ্ধতির দুয়ার খুলে দিলেন আলাউদ্দিন। সরোদের বোলে নতুন সংযোজন ঘটল।

এমনি ভাবে ভারতীয় যন্ত্র সঙ্গীতের প্রতিটি ধারাতেই তার সৃজনশীল হাতের স্পর্শ লেগেছে। সেতারে মসিদখানি বা রেজাখানি 'বাজে'র কোনটাই তিনি অনুকরণ করেন নি, অথচ দু'টি ধারার রসে সিঞ্চিত হয়েছে তার বাজনা। রবাব-বীনের 'তারপরণ' প্রচলিত হয়েছে তার সরোদে-সেতারে। তবলায়-পাখোয়াজে সমান কৃতিত্ব থাকাতে তার প্রচলিত 'বাজে' এসেছে ছন্দের অভিনব বৈচিত্র। সমস্ত সঙ্গীতের ভাষা যার অধিগত সে-ই পারে তার প্রকাশের সুন্দরতম রূপটি বেছে নিতে।

আলাউদ্দিন একেবারে অনাথ দরিদ্র অন্ধ আতুরের মধ্যে নেমে এলেন। ঢেড়া পিটিয়ে নাম গোত্রহীন একশ' জনকে জড় করা হল। তার বাড়ী হয়ে উঠল দীন দরিদ্রের লঙ্গরখানা। নিজে বসলেন হার-মোনিয়াম নিয়ে সকলের মধ্যে। উদ্ভাবন করলেন নতুন নতুন যন্ত্র। মনোহরা, চন্দ্র সারং, কাষ্ঠ তরঙ্গ। মহারাজা বলেছিলেন, "ওস্তাদজী আমার রাজ্যে একটা সঙ্গীতের পরিবেশ সৃষ্টি করুণ। বে-সুর যেন না থাকে।"

অচিরেই দেখা গেল কোন যাদু স্পর্শে ঐ নিরক্ষর দরিদ্র লোক গুলি ভারতের শ্রেষ্ঠ ব্যাণ্ড বাদক হয়ে উঠল। তবলার তালিম দিলেন এক অন্ধকে। ইউরোপের মত 'সরগম' দেখে বাজাবার দরকার নেই। সুরেতে কান বাঁধা।

সুরের ইঙ্গিতে পরিবর্তন। একশ'টি বিভিন্ন যন্ত্রের সমতা। ধরণ, ছাড়ন। মাইহার ব্যাণ্ডের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল সারা ভারতে। আলাউদ্দিন শিষ্যরা আজো বলেন, 'গুরুজীর জীবীত কালে মনে হত মাইহারের মাটিতেও যেন সঙ্গীত মিশে আছে। মাইহারের মাটিতে পা দিয়েই শিষ্যরা তা অনুভব করতে পারত।'

* * *

ভৈঁইসের মত গলার স্বর। মহারাজ বললেন, "আমি গান শিখব"

"না, আপনার দ্বারা গান হবে না।"

"কেন ওস্তাদজী?"

"আপনি সরাব ছাড়তে পারবেন?"

একটু চুপ থেকে মহারাজ বললেন, "ছাড়ব।"

"রানী মা ছাড়া অপর কোন রমণীর দিকে দৃষ্টি দিতে পারবেন না।"

"আচ্ছা, তাই হবে।"

"শিক্ষাকালে ব্রহ্মচর্য।"

"অতটা পারব না ওস্তাদজী, তবে চেষ্টা করব।"

"আমি যে ভাবে বলব সে ভাবে চলতে হবে।"

"তথাস্তু।"

সঙ্গীতই ঈশ্বর। সাধনায় তন্নিষ্ঠ হওয়াই আলাউদ্দিনের জীবন দর্শন। কোন অজুহাত নেই। কোন বিকল্প নেই। কোন হেলা-ফেলা চলে না। সুর বিকৃতি তার কাছে দুঃসহ। সদাহাস্য বিনয়ী মানুষটি বাঘের মত সতর্ক, সিংহের মত হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন কোন পর্দার স্খলন ঘটালে। হোক পুত্র, হোক শিষ্য, হোক মহারাজ, কাউকে রেয়াৎ নেই। কিল চড় পড়ে। মহারাজার হাত মুচড়ে দেন। গালাগাল পাড়েন। কখনো বা তিনি চোখের জলে ভাসেন।

বছর না ফুরতেই মহারাজার ভৈঁইসের মত গলা তারের মত সুরেলা হয়ে উঠল। রাণী মারাও গান শিখতে লাগলেন। দেশ থেকে ছোট ভাই আয়েত আলি খাঁ এসে আছেন মাইহারে। এবার কলকাতা থেকে এলেন তিমির বরণ ভট্টাচার্য। ১৯২৫ সাল।

॥ দুই ॥

পঞ্চাশ কোটি বছর অন্ধকারে মাথা খুঁড়ে জীব জগত তার এই চক্ষু রত্ন দুটি পেয়েছে। আজ কত সহজেই না বলা যায়, তাকালেম, দেখলাম। ভারতের চারদিক থেকে একে একে শিষ্যরা আসতে লাগল মাইহারে। গুরুর কাছে হাত পাতল, পেল। কত সহজ। কিন্তু এর পেছনে চাপা পড়ে আছে চল্লিশ বছরের উর্ধ্বে অন্ধকারে মাথা কোটার নির্ম্মম ইতিহাস। সে ইতিহাসের সন তারিখের হিসেব নেই। নাম ধামেরও গোলমাল হয়ে যায়। কিন্তু সুরের সামান্যতম আঁচড় টুকুও গাঁথা হয়ে আছে। একের সঙ্গে আর গুলিয়ে যায় নি। অভূতপূর্ব তার স্মরণ শক্তি। নেহাৎ শিশু কালে শোনা গানের সুরও অবলীলাক্রমে গেয়ে শুনিয়ে দিতে পারেন সঠিক ব্যাঞ্জনায়।—"কইও দুস্‌ক বন্ধুর লাগ পাইলে—"

তখন মাইহার সঙ্গীত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ তিনি। দেশ স্বাধীন হয়েছে। রাজা মহারাজার যুগ শেষ। সরকারের অনুদানে বিদ্যালয় চলে। আলাউদ্দিন পাঁচশ' টাকা বেতন পান।

বিদ্যালয়ের সমুখ পথে কয়েকজন গেঁও লোক ঢোল কাঁধে চলেছে বাজারের দিকে, ঢোল বেচবে বোলে। কে জানে কোন বালক কালের স্মৃতি জেগে উঠল এই অশীতিপর বৃদ্ধের মনে। তিনি তড়িৎ গতিতে এসে একখানা ঢোল নিজের গলায় ঝুলিয়ে বাজাতে সুরু করে দিলেন। বোলের ফুলঝুরি উঠল। যে কোন পাকা ঢুলির সারা জীবনের সাধনার বস্তু। মুখে বোল বলছে, হাতে ছন্দের লীলায়িত দোলায় দুলিয়ে দিচ্ছে ভীড় করে আসা সাধারণ মানুষ গুলিকে। ছাত্ররা বিস্ময়ে হতবাক। গুরুজীকে কেউ কোনদিনও ঢোল বাজাতে দেখে নি, শোনেও নি।

এমনি অম্লান হয়ে রয়েছে সারা জীবনের সঞ্চয়। তাই আলা-উদ্দিন ভাল-মন্দের বাছ-বিচার, গ্রহণ-বর্জন করতে পেরেছেন সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে। সার বস্তুটাকে তুলে দিতে পেরেছেন শিষ্যদের হাতে। নিজে কাঁটার ঘায়ে ক্ষত বিক্ষত। কিন্তু শিষ্যদের চলার পথ করে দিয়েছেন সুগম, মসৃন।

বাঁশী, শানাই, সরোদ, সেতার, সুরবাহার, সুরশৃঙ্গার, তবলা, পাখোয়াজ, ক্ল্যারিওনেট, ফিড্‌ল, কর্ণেট, বেহালা, হারমোনিয়াম, যে যা যন্ত্র নিয়ে এসেছে আলাউদ্দিন তাই উজার করে শিখিয়েছেন। শিষ্যের গ্রহণ করার ক্ষমতা বুঝে শিক্ষাক্রম তৈরি করেছেন। প্রতিটি শিষ্যের জন্যে আলাদা আলাদা ব্যবস্থা। আলাদা আলাদা সময়। সুরের দুরূহ বাঁকে গুরুজীর কণ্ঠ ধ্বনিত হয়ে ওঠে, সুরে সুরে, পর্দায় পর্দায়। যেন হাত ধরে শিষ্যকে পার করে দেন দুরূহ বাঁকগুলি। সুরে 'সরগাম' করে প্রতিটি শিষ্যের মনে গেঁথে দেন রাগের ভাবমূর্তি।

তপবন। খিড়কি দিয়ে দূরে পড়ন্ত রৌদ্রের দিকে চেয়ে নিরাভরন চৌকিতে বসে আছেন গুরু। মৃদু মন্দ টানে তামাকু সেবন করছেন। শান্ত সমাহিত। শিষ্যের প্রতীক্ষায়। এই তার শয়ন কক্ষ। মেঝেতে শিষ্যের জন্যে আসন পাতা। শিষ্য প্রণাম করে আসন গ্রহণ করলে আস্তে কাস্তে ঘুরে বসেন শিষ্যের মুখের দিকে চেয়ে।

প্রথম প্রথম শিষ্যের এই প্রণামের সেবাটুকুও গ্রহণে নারাজ ছিলেন আলাউদ্দিন। হাত পা ছুড়ে গালাগাল করে বলে উঠতেন, "হায়! হায়! ব্রাহ্মণের পুলাগুলি আমার পা ছুয়ে পাপের ভাগী করছে।"

জব্বলপুর সঙ্গীত কলেজের অধ্যাপক গ্রীষ্মের ছুটিতে এসেছেন মাইহারে। গুরুজীর কাছে সেতারের তালিম নিতে। সঙ্গে এনে-

ছেন জব্বলপুরের সেরা মিষ্টি। গুরুজী বাজারে না কোথায় গিয়েছেন বলে সকালে দেখা হল না। গুরুমাতার হাতে মিঠাই-এর ভাণ্ডটি দিয়ে এলেন। সেদিন ছিল শুক্রবার। বিশ্রামের দিন। সন্ধ্যায় শিষ্যরা একে একে এসে জড় হন গুরুজীর ঘরে। তার জীবনের নানা গল্পগাছা শুনে সময় কাটান।

এ কথা সে কথা বলার পর হঠাৎ ঐ জব্বলপুরের অধ্যাপককে দেখিয়ে বললেন, "প্রফেসার সাহাব জব্বলপুর হইতে আমার জন্য মিঠাই আনছেন। বড়িয়া মিঠাই। তা নর্দমায় ফেলে দিলে উনি কষ্ট পাবেন। তাই আমাদের ঐ নেড়ি কুকুরগুলাকে খাওয়াইয়া দিছি।"

অধ্যাপক অধঃবদন। আরো দু'একজন শিষ্য গ্রীষ্মের বাছাই করা আম এনেছিলেন ব্যাগে পুরে। তারা প্রমাদ গুনলেন। ভাগ্যে একথা প্রকাশ করা হয়নি গুরুজীর সামনে। গুরুজী বললেন, "তোমাদের ভরণ-পোষণ দিয়া রাখতে পারি না। আগে তাও রাখছি। এখন আমার পুষ্যি অনেক। তোমরা আমাকে দিবা কি? আমি গুরু, আমি তোমাদের দিমু।"

দূর দূরান্তের শিষ্যদের জন্যেও তিনি ভাবিত। যে কোন সঙ্গীত সমস্যা নিয়ে তার কাছে লিখলেই জবাব মেলে। পত্র যোগে চলে নির্দেশ-উপদেশ। তত্ত্ব আলোচনা। নিজ হাতে লেখেন, "... বিলাসখানি টুরিতে অতি কুমল রেখাব, অতি কুমল ধৈবত ও নিখাত ব্যবহার হয়। তাহা যদি বুঝে লাগাতে পারেন তবে ঠিক বিলাস-খানি মনে হবে, স্বর ঠিক না লাগাতে পারিলে ভৈরবী হবে, ভৈরবীতে যে সব স্বর বিলাসখানিতে তাই লেগে থাকে।..."

...পরজ কাফিমেলে হরশৃঙ্গার উৎপন্ন। এ সব রাগ দাক্ষিণাত্য করণাট দেশে গায়েন বাদন করে থাকে। এতদ দেশে এই সব রাগের প্রচার নাই।..."

এমনি অজস্র চিঠিপত্র ছড়িয়ে আছে শিষ্যদের কাছে। জীবনের যা কিছু সঞ্চয় নিঃশেষে উজার করে দিয়েই যেন তার মুক্তি। এমন হয়, শেখাতে গিয়ে মুখে মুখে চার হাজার পাল্‌টা বলে যান সুরে। একই রাগে, নির্দিষ্ট সংখ্যক পর্দায়। ঘড়ির কাঁটা যেন স্তব্ধ হয়ে যায়। দু'ঘণ্টা, তিন ঘণ্টা, চার ঘণ্টা···কখন অতিবাহিত, ক্লান্তিহীন।

মিঞা তানসেন তার অধিগত বিদ্যা দান করেছিলেন তার পুত্র ও জামাতাকে। 'সেনী ঘরণার' সূচনা হয়েছিল তাদের ঘিরে। আলা-উদ্দিনও মিঞা তানসেনের মত নতুন যুগের সূচনা করলেন পুত্র আর জামাতাকে দিয়ে। সরোদে-সেতারে। কিন্তু তার দিগন্ত বিস্তৃত অধিগত বিদ্যা ধারণ করা এই শক্তিমান দুই শিল্পীর পক্ষেও সম্ভবে না।

আলাউদ্দিন বলেন, "মা অন্নপূর্ণা আমার সাক্ষাত ভগবতী। আমার ধ্রুপদ অঙ্গের যা কিছু সব তাকেই দিয়েছি। আলি আকবর রবিশঙ্করের চেয়ে সে কোন অংশে কম নয়।" তবু অফুরান তার ভাণ্ডার। শিল্পীর জীবদ্দশাতেই দু'কূল প্লাবি 'ঘরণা' ভাঙা বন্যায় মিঞা তানসেনের চেয়েও বিস্তৃত হয়েছে তার সুরের দিগন্ত। সেই ধারাতে অবগাহন করে এই তপবনের সঙ্গীত আশ্রম থেকে একে একে বেরিয়ে আসেন আয়েত আলি খাঁ, তিমিরবরণ, পান্নালাল ঘোষ, আলি আকবর খাঁ, অন্নপূর্ণা দেবী, রবিশঙ্কর, বাহাদুর খাঁ, নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ভারতের সঙ্গীত জগতের দিকপালগণ। বাঙলার গৌরব।

এরা একই সৃষ্টি রসের ধারায় তৈরী। কিন্তু নিজ নিজ ক্ষেত্রে একক। আলাউদ্দিনের শিক্ষাদানের পদ্ধতিতে রয়েছে সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশের অবকাশ। তার শিক্ষার প্রসাদেই রবিশঙ্কর থেকে-নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়কে আলাদা করে চিনে নিতে অসুবিধা হয়

না। উৎস এক, কিন্তু চলন আলাদা। শুধু ঘরণার অনুলিপি-প্রতিচ্ছবি নয়। একই সলিলে সিঞ্চিত বৈচিত্রময় বাগিচা।

শিষ্যদের সন্তান সন্ততির শিক্ষাদানের ভারও তুলে নেন গুরুজী। তার বলিষ্ঠ দীর্ঘ কর্মঠ জীবন আগলে থাকে দুই পুরুষ ব্যাপী। আশিস, ধ্যানেশ (আলি আকবরের পুত্রদ্বয়) ইন্দ্রনীল (তিমির বরণের পুত্র) শরণরানী প্রমুখ নাতি-নাতনির দলও তৈরি হয় তার হাতে।

ষাটের দশকে কালের অমোঘ স্পর্শে ধীরে ধীরে শ্লথ হয়ে আসে কর্মময় দিনগুলি। এক তরুণতম শিষ্যকে লেখেন, "...তুমি এখানে আসবা না।" এই কথা ক'টি লিখেই হয়ত গুরুর মনে পড়ে শিষ্যের করুণ মুখচ্ছবি। বিমুখ করলাম। নিজেই যেন করুণা চায় শিষ্যের কাছে। লেখেন, "আমার বয়স হয়েছে।" তবু যেন মনটা খচ্‌খচ্‌ করে। পরের লাইনে লিখলেন, "তুমি যা ভাল বুঝ কর।"

আলাউদ্দিন কলকাতায় এসেছেন। আলি আকবর কলেজ অব মিউজিক-এর বাড়িতে তরুণ শিষ্য ভক্তের দল তাকে ঘিরে বসেছে। উনি জীবন পাঁচালী বলছেন। আশিস টেপ রেকর্ড করে নিচ্ছে। কথার মাঝে মাঝে গান গেয়ে সুরের আবেশ ছড়িয়ে দিচ্ছেন। উপভোগ্য আসর। হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে তার পাশে বসা মলিন বসনা শীর্ণকায়া একটি তরুণীকে দেখিয়ে করজোড়ে বলতে লাগলেন, "বহু দূর, আমার দেশ ত্রিপুরা থেকে উনি আসছেন সঙ্গীত বিদ্যা শিক্ষা করবার জন্যে। পুইসা নাই। কপর্দকহীন। আমি এই বালিকার জন্যে ভিক্ষা মাগ্‌তাছি।" বলতে বলতে নিজের পকেট থেকে একটা পুরানো মনিব্যাগ খুলে দু'তিন টাকা যা ছিল টেনে টেনে বার করতে লাগলেন। "আমার দিন শেষ। ক্ষমতা নাই। অর্থের অভাবে এ বালিকা যদি বিদ্যা শিক্ষা না করতে পারে, তবে আমার প্যাচাল শুইন্যা আপনাদের কুন কাম হবে?"

শিষ্য ভক্তরা প্রতিশ্রুতি দিয়ে বৃদ্ধকে শান্ত করল। জানি না তা রক্ষিত হয়েছিল কিনা। কিন্তু টেপ রেকর্ডার খুললে আজো শুনতে পাওয়া যাবে সেই করুণ আকুতি। শিষ্যের জন্যে ভিক্ষা মাগে, এ কোন দেশের, কোন যুগের গুরু ?

॥ তিন ॥

গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবনখানি
তখন তারে চিনি আমি, তখন তারে জানি ॥

১৯৩৪ সাল। উদয়শঙ্করের নাচের দলের সঙ্গে আচার্য আলাউদ্দিনও বেরিয়ে পড়লেন বিশ্বপরিক্রমায়। বাউল মন। ঘর-ছাড়ার ডাক তার রক্তে। উদয়ের এক ডাকেই সারা দিল। উদয়ের সঙ্গে রবিশঙ্কর, সিমকি, জহুরা প্রমুখ সব তরুণের ভীরে যেন ভারতীয় সংস্কৃতির বয়ঃজ্যেষ্ঠ ভীষ্ম চলেছেন। বম্বাই থেকে জাহাজ ভাসল। কূলহারা আরব সাগরের বুকে দাঁড়িয়ে মনে পড়ছে গোয়ালন্দের স্টীমারের চাকায় পদ্মার ঢেউ ভাঙার দৃশ্য। চলে গেলেন আট বছরের জীবনে। মনে হল উদ্দীপনায় উচ্ছ্বাসে তিনি তরুণতম।

পোর্ট সৈয়দ হয়ে জেরুজালেম, জাফা, একার, স্মার্ণা, মিশর, প্রভৃতি আরব ভূমির বড় বড় শহরে তাদের অনুষ্ঠান হল। বিপুল ভাবে সম্বর্ধিত হল সর্বত্র। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের পরে প্রথম উল্লেখযোগ্য ভারতীয় সংস্কৃতির দূত।

আলাউদ্দিন কান পেতে থাকে মাটির কাছাকাছি। যেখান থেকে যতটুকু সুর শুনতে পাওয়া যায়। সকাল সন্ধ্যা আজানের সুললিত ধ্বনি ওঠে চারদিকে। আশ্চর্য। সেই দুর্গা। সেই সিন্ধু

ভৈরবী। কোরাণ পাঠের কি সুরেলা উচ্চারণ। স্বরের আরোহী অবরহী নিয়মে বাঁধা। ছন্দে দোলা দেয়। দেহাতের তরুণ-তরুণীরা প্রাণ খুলে গান গায়। সেই সুরে হয় চেনা, হয় জানা।

দেশে থাকতে মোল্লাদের আবেভাবে এইটাই প্রকাশ পেত যেন মুসলমানদের 'নৃত্য, গীত, বাদ্যে' যোগ দেওয়া অনুচিত! গুণা। কিন্তু এদেশে দর্শকরা তো সবাই মুসলমান! উদয়শঙ্করের বেশির ভাগ নৃত্য নাট্য হিন্দুদের দেবদেবীকে আশ্রয় করে। তবে সাধারণ মানুষের এত ভীড় কেন? আলাউদ্দিন বাজনা শেষে তন্ময়তা ভেঙে চেয়ে দেখেন তার সামনে সেই রাম, সেই রহিম। 'শুধু এদের আগে কখনো দেখিনি, এদের ভাষা জানিনে।' অন্তরে সুরের পরশ লাগিয়ে দিলে সেই এক মানুষ, এক জাতি।

উদয়শঙ্কর একদিন বললেন, "ওস্তাদজী, আমরা মক্কার কাছাকাছি এসেছি। আপনি ইচ্ছা করলে মক্কা শরীফ দর্শন করে আসতে পারেন।"

সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম দিকে মুখ করে নমাজ পড়ার ভঙ্গীতে সামনের দিকে দু'হাত বাড়িয়ে বললেন, "আমার বহুদিনের স্বপ্ন। কিন্তু আলাতাল্লার ইচ্ছা নয় আমি তা দর্শন করি!"

"কেন? কেন?"

"এতগুলি মুসলমান রাজ্য আমরা ঘুরলাম। সবখানেই সাধারণ মানুষ তুমারে রাজপুত্রের মত সমাদর করল। সুরের মধ্যে দিয়া আমরা তাদের অন্তরে পৌঁছলাম। এইখানে তো বাবা তুমি যাইতে পারবা না। এইখানে ধর্মের পেয়াদা আছে।"

"তাতে কি হয়েছে, আপনি একাই যান।"

"এত কাছে আসছি. মক্কা শরীফ দেখা হবে না, এর চেয়ে বড় দুঃখ কি আছে। এক সঙ্গে বেরিয়েছি—তুমাদের ছেড়ে আমি যেতে পারি না।" বলতে বলতে আলাউদ্দিনের দু'চোখ ভিজে উঠল।

"এখানে দিনে রাতে আজানের সুরের মধ্যে দিয়েই হজরতের বানী আমি শুনতে পাচ্ছি। পরে কুন দিন দয়াময় ডাকলে মক্কা শরীফ দর্শন করব।"

ভারতবর্ষে থাকতেও অনেক দেবালয়ের দুয়ার বন্ধ হয়েছে তার সামনে। প্রবেশের অধিকার মেলেনি। সে গ্লানি হিন্দু সম্প্রদায়ের। মুসলমানের হয়ে প্রায়শ্চিত্ত করলেন আলাউদ্দিন নীরব প্রতিবাদে, চোখের জলে।

মিশর থেকে গ্রীস হয়ে ইউরোপ পরিক্রমা সুরু হল। বুলগেরিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, রুমানিয়া, হাঙ্গেরী, অষ্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড, সুইডেন, ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের বড় বড় শহরে প্রায় চার মাস ধরে অনুষ্ঠান চলল। রাজারাজড়া, মন্ত্রী, প্রেসিডেণ্টদের পার্টি, খবরের কাগজ ভর্তি ছবি, আর সব থিয়েটারে সাধারণ দর্শকের ভীড়। রাত্রে যখন মঞ্চ থেকে হোটেলে ফেরে—দলে দলে লোক দাঁড়িয়ে থাকে ভারতীয় সাংস্কৃতিক দলটিকে দেখবার জন্যে। ইউরোপের সর্বত্রই এরকম ভীড় লেগে যায়। এক লণ্ডন ছাড়া।

আর একটি দেশেও বে-সুর বাজে। জার্ম্মানিতে অসুরের রাজত্ব সুরু হয়েছে।

নাৎসী বাহিনী নিয়ে ১৯৩৩ সালে হিটলার ক্ষমতা দখল করেছে। মানব ইতিহাসে যা কিছু সুন্দর, যা কিছু কল্যাণকর তার বিরুদ্ধেই যেন তার জেহাদ।

উদয়শঙ্করের দলের ম্যানেজার গ্রাটা, চালাক-চতুর যুবক, জাতে ইহুদি। তাই জার্ম্মানিতে ভারতীয় সাংস্কৃতিক দলের অনুষ্ঠান নিষেধ। সভ্যের বর্বর অসভ্যতা। এই নাৎসীদের ফ্যাসিষ্ট দোসর মুসোলিনীর ইতালিতেও উদয়শঙ্করের কোন অনুষ্ঠান হল না।

কমিউনিষ্ট বলে, ইহুদি বলে মানুষ হত্যার যে বীজ উপ্ত হয়েছিল

সেদিন জার্ম্মানিতে তার যে কি বিষময় ফল ফলেছিল পৃথিবীর বুকে —সে সাক্ষী রয়েছে ইতিহাস। আলাউদ্দিন রাজানীতি বোঝেন না, সমাজ বিজ্ঞানেরও ধার ধারেন না, কিন্তু তার সহজাত শিল্পী মন সেদিন ইউরোপে যে অশুভ শক্তি বিকাশের ইঙ্গিত পেয়েছিল, যে সত্যি উদঘাটিত হয়েছিল তার কাছে,—বিশ বছর পরে ইউরোপের স্মৃতিচারণ করতে গিয় সে কথা উল্লেখ করতে ভোলেন নি। সোচ্চারে অনুচ্চারে কবিগুরুর মতই আলাউদ্দিন চিরকাল থেকে গেছেন মানুষের পক্ষে।

সাধারণ মানুষের ভীড়ে, সুরের মাধ্যমে আর এক ইউরোপের পরিচয় পেলেন আলাউদ্দিন। নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হল তার সামনে।

॥ চার ॥

ভারতবর্ষে তখন সামন্ততন্ত্রের ভাঙন সুরু হয়েছে। কিন্তু বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পীরা তখনো মুক্তি পায় নি রাজা-মহারাজা-জমিদারদের নিগড় থেকে। সমাজে তাদের প্রতিপালনের বিকল্প ব্যবস্থা তখনো গড়ে ওঠেনি। মুষ্টিমেয় কয়েকজন ধনীর মনরঞ্জনের ওপরই তাদের নির্ভর, আশ্রয়।

সেই মানসিকতায় আবদ্ধ আলাউদ্দিন ইউরোপে হাজার হাজার শ্রোতাকে সামনে দেখে অভিভূত হয়ে পড়লেন। সঙ্গীত আসরের এই গুণগত পরিবর্তন তার কাছে নতুন, অভাবনীয়। এখানে সাধারণ মানুষের যুগ সুরু হয়ে গেছে।

পরিণত বয়সেও আলাউদ্দিন অভ্যাসের খুঁটি আঁকড়ে ধরে থাকেন নি। দীর্ঘ দিনের সংস্কার তার চলার পথে বাঁধা হল না।

তিনি সহজাত বুদ্ধি দিয়েই বুঝে নিলেন—এই সাধারণ মানুষের যুগই আসছে সর্বত্র। দেশে ও বিদেশে। আগামী দিনের শ্রোতাদের তিনি অন্তর দিয়ে গ্রহণ করলেন পরম উচ্ছ্বাসে।

ভিয়েনা, প্রাগ, বুদাপেষ্ট, প্যারিস প্রভৃতি শহরের সঙ্গীত ভবন গুলি দেখে আলাউদ্দিন ভাবেন, 'এ কুথায় এলাম!' দেশের চিঠিতে লিখলেন, "...সুধু তাদের উচ্চ সঙ্গীত ২০০ সত ৩০০ সত লোকের এক সঙ্গে অরকেষ্টা বাজাবার জন্য, কুটি ২ টাকা ব্যায় সুধু সঙ্গীতের বাড়ির জন্য। এসব দেখে স্বপ্ন বলে মনে হয়..."

সঙ্গীতকে দরবারের নিগড় ভেঙে মুক্ত করে দেবার মধ্যে শিল্পীর যে সার্থকতা—যে আনন্দ রয়েছে, তা তিনি এই প্রথম অনুভব করলেন জনাকীর্ণ এই বিশাল সঙ্গীত ভবনগুলির গভীরে। বহুজনার মধ্যে ব্যাপ্তীর আনন্দ। তিনি প্যারিস থেকে লিখলেন, "...যে সময় সঙ্গীত হয়, সরদ বাদ্য করি সে সময় ১০ হাজার ৮ হাজার লোকের সমিপে তখন মনে হয় এখানে মানোষ নাই, এত মনযুগ দিয়া শুনে। আরও মনে হয় সরদের মির নাট্যমন্দির ছেয়ে যায় তখন বাজাইয়া নিজেও আনন্দ পাই। বাদ্য শেস্ হইলেই ৫ মিনিট পর্যন্ত করতালি দেয়, ফুলের তুড়া উপরে ছুইরে ফেলে, ঢের লেগে যায়—এদেশে সরদ বাজাইয়া খুব আনন্দ পাইতেছি।"

সনাতনী মন নিয়ে ইউরোপের দিকে চেয়ে 'জড়বাদী' বলে, 'যন্ত্র সভ্যতার দাস' বলে যারা উন্নাসিক হন, সস্তায় হাততালি যোগার করেন, আলাউদ্দিন তাঁদের দলে নন। তার মতে এই সঙ্গীত ভবন বিজ্ঞানের সাহায্যে এমন ভাবে নির্মিত হয়েছে যে সূক্ষ্ম: মীড়ের কাজও শেষ পর্যন্ত শোনা যায়, এতে করে বিজ্ঞান তো সঙ্গীতকে ব্যাপ্তীর পথেই এগিয়ে দিলে, বাধা হল কোথায়? তিনি অকপটে স্বীকার করলেন, এমন আত্মহারা হয়ে দেশেও কোথাও কখনো বাজাইনি। আমার কাঠের যন্ত্র প্রাণবান হয়ে উঠত। ইউরোপের

শ্রোতাদের কাছে বাজিয়ে যে আনন্দ পেয়েছি, এমন আর কোথাও পাইনি।

ইউরোপের পথে ঘাটে চলতে সবাই তাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। ট্রামে-বাসে বয়ঃজ্যেষ্ঠ বলে সসম্মানে আসন ছেড়ে দিয়েছে আলাউদ্দিনকে। চেকোশ্লোভাকিয়ার রাজধানী প্রাগে বাসে উঠতে যাচ্ছে অমনি একটি মেয়ে হাত বাড়িয়ে দিলে তার দিকে। প্রাচ্যের সংস্কারবসে আলাউদ্দিন হাত সরিয়ে নিলেন। মেয়েটি যত হাত বাড়িয়ে দেয় উনি তত পিছিয়ে আসেন। শেষ পর্যন্ত এক প্রকার পাঁজা কোলে করেই আলাউদ্দিনকে বাসে তুলে নিলে।

এর মধ্যে বে-সুর কোথায়? অসুন্দরই বা কি? যেটুকু তাল কাটছে, খোঁচা লাগছে—তা হল ভারতীয় সংস্কারের আবিলতা। আলাউদ্দিন এমনি ভাবেই আত্মবিশ্লেষণ করলেন। খোলা মন নিয়ে বিচার করলেন ইউরোপের জীবনযাত্রাকে। ছেলে মেয়েদের অবাধ মেলামেশা, স্নান, সমুদ্রের ধারে শুয়ে থাকা, খেলাধুলা, নাচ গান, সমবেত ব্যায়াম, এতটুকু বিষদৃশ মনে হল না। অত্যন্ত সহজ, স্বাভাবিক, সুন্দর।

চরিত্রহীন এ দেশেও আছে, ও দেশেও আছে।

প্যারিসের যে হোটেল-ঘরে আলাউদ্দিন রয়েছেন একদিন সেখানে হুড়মুড় করে কতকগুলা মেয়ে ঢুকে পড়ল। তার মধ্যে আমেরিকানও রয়েছে কয়েকজনা। বুড়োর বাজনা শুনবে। আলাউদ্দিনের প্রথম প্রতিক্রিয়া হল—এরা হুজুগে চলেছে। প্রাচ্যের সঙ্গীত শোনা আজকাল এদের একটা ফ্যাসান। তখন বিকেল তিনটে। কিছুটা বিরক্তির সঙ্গে ধরলেন 'ভীমপলশ্রী'। সুরের ঝঙ্কার তুলতেই দেখলেন, না, এরা তো সে জাতের নয়: মন দিয়ে শুনছে। সুরের ভেতরে ঢুকতে চেষ্টা করছে। বাইরের খোলস দেখে বোঝা যায়নি।

আলাউদ্দিন আস্তে আস্তে তন্ময় হয়ে গেলেন। মেয়েরাও আর ঘরি দেখলে না। কখন তিন ঘণ্টা পার হয়ে গেছে। বাজনা বন্ধ হবার পরও সব চুপচাপ। চোখ বাষ্পাকুল। আচমকা সবাই মিলে বৃদ্ধকে জড়িয়ে ধরে আবেগভরে কপালে চুমু খেতে লাগল।

অভিনব অভিনন্দন। এও ইউরোপের এক অভিজ্ঞতা।

ধনীর দুলারী এলিস বোনার উদয়শঙ্করের একজন প্রধান হিতৈষীণী। অচলা ভক্তি তাব ভারতীয় সংস্কৃতির বেদীমূলে। অর্থ দিয়ে, সামর্থ্য দিয়ে এলিস বোনার এগিয়ে এলেন তাদের সহায়তায়। চার মাস কাটল প্যারিসে।

উদয়শঙ্করের দলের সঙ্গে নানাবিধ ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র ছিল। তাই দিয়ে প্যারিসে এক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হল। উদ্যোক্তৃ এলিস বোনার। সাধারণ মানুষ ভীড় করে এল দেখতে। ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে তাদের নানা প্রশ্ন, নানা কৌতূহল। আলাউদ্দিন একেকবার একেকটি যন্ত্র বাজিয়ে তাদের জবাব দিলেন সুরে। চার দিকে বিমুগ্ধ মানুষগুলির মুখের দিকে চেয়ে আত্মপ্রত্যয়ে ভরপুর হয়ে ওঠেন। ভারতীয় সঙ্গীতের বিশ্ব দরবারে উত্তরণের কাল আগত প্রায়!

এতদ দেশে তার আগেও নাকি আর একজন সরোদ বাজিয়ে মাত করে দিয়ে গেছেন। শুনে আলাউদ্দিন আত্মহারা। 'ও আমার ছাত্র তিমিরবরণ।'

বিশ বছর পরে তার জীবদ্দশাতেই দেখতে পেলেন ভারতীয় সঙ্গীতের জয়যাত্রা। বিশ্বের সঙ্গীত জগত বরণ করে নিয়েছে পুত্র আলি আকবর, জামাতা রবিশঙ্করকে। ক্রমে সেই মিছিলে যোগ দিয়েছেন নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়, আশিস, ইন্দ্রনীল প্রমুখ শিষ্যের দল। ভারতের বাইরে উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিমে তারা জ্বালিয়ে

দিয়েছেন ভারতীয় সুরের অনির্বাণ দীপ শিখা। সেই আলোতে ভাস্বর, শিষ্য-মুখে বার বার উচ্চারিত একটি নাম—শ্রীআলাউদ্দিন।

*　　*　　*

বুদাপেস্টে অনুষ্ঠান কালে একদিন ইউরোপের নামজাদা শিল্পী সমাজদাররা এলেন আলাউদ্দিন সকাশে, ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের মর্ম কথা বোঝবার জন্যে।। উদয়শঙ্কর হলে দোভাষী। আলোচনা বেশ জমে উঠল।

"আপনি কি কোন সঙ্গীত কম্পোজ করেছেন?"

"না।"

ইউরোপের সমাজদাররা এ জবাব শুনে একটু থতিয়ে গেলেন। আলাউদ্দিন বুঝে বললেন, "আমাদের সঙ্গীত তো কেউ কম্পোজ করে না ইউরোপের মত। ভারতের ঋষিরা সেই কোন যুগে ভগবানের কাছ থেকে রাগ-রাগিণী পেয়েছেন। আমরা শুধু তার প্রকাশের সাধনা করি।"

"রাগ-রাগিণীর সময় বিভাগ দয়া করে আমাদের বুঝিয়ে বলবেন?"

তখন বিকেল পাঁচটা, আর তিন ঘণ্টা পরে সন্ধ্যা হবে। আলাউদ্দিন ধরলেন 'ভৈরবী'। সবাই চোখ বুজে মন দিয়ে শুনলেন। বাজনা শেষ করে আলাউদ্দিন শুধালেন, "কি বুঝলেন?"

একজন জবাব করলেন, "মনে হল গীর্জায় বসে প্রার্থণা করছি।"

আর একজন সমাজদার বললেন, "ভোর বেলায় একলা বসে আছি নির্জনে, যার উপাসনা করছি সে এল না।"

ভারতীয় সঙ্গীতে প্রহরের নানা ভাব যে বোঝান যায় এ কথা উপস্থিত সবাই স্বীকার করলেন। 'ভীমপলশ্রী'কে একজন বললেন, "এ সুরে বড় কান্না আসে। তোমাদের সঙ্গীতে এত করুণ সুর কি করে সম্ভব হয়? এত কান্না আসে কেন?"

আমাদের সঙ্গীতে সাতটি স্বরের বাইশটি শ্রুতি। একুশটি মূর্চ্ছনা আছে। সা থেকে রে-এর মধ্যে চারটে ঘাট। আমরা যে এই চারটি শ্রুতিকে আলাদা করে ধরতে পারি।"

"বিশ্বাস হয় না। বাজিয়ে দেখান।"

আলাউদ্দিন প্রতিটা শ্রুতি বাজিয়ে দেখালেন। সা থেকে নি পর্যন্ত। ইউরোপীয় গুণীরা অবাক। "তোমাদের কান এত সূক্ষ্ম ধ্বনির পার্থক্য ধরতে পারে!"

"পারে বলেই তো আমাদের রাগ-রাগিণী এত সুরেলা। তাতে কাটা কাটা খাপছাড়া আওয়াজ হয় না। তোমাদের বারটা স্বর, তিন প্রকারের তাল বা টাইম। আমাদের বাইশটি শ্রুতি, তিনশ' ষাট প্রকারের তাল আছে।"

এবার তবলা নিয়ে বসলেন আলাউদ্দিন। চৌতাল, ঝাঁপতাল, সুরফাঁক, ধামার. আড়াচৌতাল, একের পর এক মুখে বোল বলে মাত্রা দেখিয়ে বাজিয়ে গেলেন। ইউরোপীয় সমাজদাররা ছন্দের গোলক ধাঁধায় যেন হাবুডুবু খেতে লাগলেন। মধ্যরাত্রি পর্যন্ত চলল এই বিদগ্ধ আলোচনা।

"ইউরোপীয় সঙ্গীত আপনার কেমন লাগে?"

"ভাল লাগে না।"

"কারণটা একটু ব্যাখ্যা করে বলবেন কি?"

"আমার সংস্কারও এর জন্যে দায়ি হতে পারে। আমরা সাধনা করি স্বরের বিশুদ্ধতা রক্ষা করার জন্যে। তারা পাশাপাশি থাকে অন্তঃলীন সূক্ষ্ম বন্ধনে। মনে হয় একই সুরের ধারা। কেউ কারো ঘারের ওপর চেপে বসে না। যেমন আপনাদের সঙ্গীতে হয়ে থাকে। আমাদের কানে তা সুরের জবরদস্তি বলে মনে হয়।"

"আমাদের সঙ্গীতে ভাল কিছু পেয়েছেন কি?"

"হাঁ, পেয়েছি।" আলাউদ্দিন অকপটে স্বীকার করলেন, 'আমি

সারা জীবন বেহালা বাজিয়েছি, কিন্তু আপনাদের বেহালা শুনে মনে হয় আমি বেহালা ধরতেই জানি না। আমার আর বেহালা বাজান উচিত নয়।"

অভ্যাগতদের বিদায় কালে আলাউদ্দিন করজোড়ে বলে উঠলেন, "দয়া করবেন। আমার বাজনা শুনে ভারতীয় সঙ্গীতের বিচার করবেন না। আমাদের পূর্বপুরুষরা সঙ্গীতে বৃষ্টি নামাতে পারতেন, ফুল ফোটাতে পারতেন, দীপ জ্বলে উঠত। আমি অক্ষম সাধক। আমার শিক্ষা সমাপ্ত হয় নাই। আমি বৃষ্টি নামাতে পারি না, আমার সঙ্গীতে ফুল ফোটে না, দীপও জ্বলে না। এই অসম্পূর্ণ বিদ্যাতেই আমার বাজনা যদি কিছুমাত্র ভাল লেগে থাকে তবে সে আমাদের সঙ্গীতের গুণ। সত্যিকারের গুণীর হাতে পড়লে তার শক্তির পরিচয় আপনারা পেতেন। কিন্তু এই অধমের জন্যে পেলেন না। আমাকে ক্ষমা করবেন।"

উদয়শঙ্কর আচার্যকে শান্ত করে বললেন, "আমাদের সম্মানিত অতিথিরা বলছেন, এক বৈঠকে ভারতীয় সঙ্গীতের সব কিছু তাদের কাছে পরিষ্কার হল না বটে, কিন্তু আপনি তাদের চোখে প্রাচ্যের বিস্ময়.!"

কবিগুরুর মন্ত্রশিষ্য ইংল্যাণ্ডবাসী এলমহার্স্ট, ধনীর সন্তান। নিজেও প্রভূত অর্থ উপার্জন করেছেন। রবীন্দ্রনাথের আদর্শই তার জীবনের দিগদর্শন। তার একমাত্র কন্যা বিয়াত্রিসেও পিতার অনুগামীনী। বিশ্বভারতী গড়ার পেছনেও এলমহার্স্টের সক্রিয় সহযোগিতা রয়েছে। তারি অনুকরণে লণ্ডন থেকে তিনশ' মাইল দূরে গড়ে তুলেছেন শান্তি আশ্রম। নাম রেখেছেন ডারটিংটন হল। আলাউদ্দিন লিখলেন, "...এখানেও শান্তিনিকেতন, কত দেশের লোক নানাহ বিদ্যা শিক্ষা করে। এখানে দৃশ্য অতি চমৎকার সাধন করিবার জায়গা বড়ই নিরিবিলি..."

এলমহার্স্টের আমন্ত্রণে ভারতীয় সাংস্কৃতিক দলটি তিন মাস রয়ে গেল ঐ 'শান্তিনিকেতনে'। এক বছর পূর্ণ হল। এলমহার্স্ট, কন্যা বিয়াত্রিসে, এলিস বোনার প্রমুখ ভারতীয় সংস্কৃতির অকৃত্রিম সুহৃদদের স্মৃতি বিজড়িত হয়ে আলাউদ্দিন ঘরে ফিরলেন।

*　　*　　*

মাইহার। মদিনা ভবন।

এবার ডাক এল স্বয়ং কবিগুরুর কাছ থেকে। যেখানে শুধু ভারতবর্ষের নয়, সারা বিশ্বের সুর এসে মিলিত হচ্ছে একটি মানুষের গভীরে। ধ্বনিত হচ্ছে একটি কণ্ঠে। 'আমন্ত্রিত অধ্যাপক' হয়ে ছ'মাসের জন্যে আলাউদ্দিন এলেন সেই সুর তীর্থ শান্তিনিকেতনে। আলাউদ্দিন বলেন, "খুদাই ঘুইরা মরলাম। গণেশ যেমন মা দুর্গাকে প্রদক্ষিণ করেছিলেন, তেমনি ওনাকে (রবীন্দ্রনাথকে) প্রদক্ষিণ করতে পারলেই দুনিয়া ঘুরার ফল হয়।"

॥ পাঁচ ॥

সত্যিই লোভনীয় প্রস্তাব এসেছিল যোধপুরের রাজদরবার থেকে। 'আপনি যোধপুরের সভা-গায়ক হোন। সারা ভারতে সম্মানের সুউচ্চ সোপানে আপনার আসন পাতা থাকবে। বেতন হাজার টাকা।'

তখন মাইহারে আলাউদ্দিনের পোষ্য-পরিজন বেড়ে গেছে। দেশ থেকে ভাই ভাতিজারা এসে থাকছেন। অর্থের প্রয়োজন। মাইহারের রাজাও খুশি হলেন শুনে। যোধপুর তার রাজ্য থেকে অনেক বড়। ওস্তাদজীর মত গুণীর সেখানেই স্থান হওয়া উচিৎ। বাড়ির সবাই উৎফুল্ল। আলাউদ্দিন মদিনা বিবিকে শুধালেন, "তুনার মন কি কয়?"

"আপনার মতই আমার মত।"

"গেলেও ভাল না গেলেও ভাল।"

"হু।"

"গেলে আমার কত টাকা কত যশ!"

"তবে যাই চলুন।"

"তুমার নিজের কুন হায়-হুতাশ নাই?"

মদিনা বিবি স্মিত হেসে সম্মতিসূচক মাথা নাড়লেন। ছায়া-সঙ্গীনী। আলাউদ্দিন মস্করা করে বললেন, "আমি যেখানেই যাই, আমার ছায়া তো ছায়াই থাকবে। তাহলে আর গেলাম না।" তার-পরে আবেগ ভরে বলে উঠলেন, "আমার প্রথম আশ্রয়দাতা, তাইন আমাকে না ছাড়লে আমি তাকে ছাড়মু না।"

বাড়ির গরুগুলি নিয়েও তার ঐ এক কথা। এক পাল গরু হয়েছে। কিছু গরু জীবনে আর দুধ দেবে না। কিছু আছে যাদের দুধ দিতে এখনো ঢের দেরী। গোয়াল ভরতি গরু, কিন্তু দুধ হয় মাত্র সের দু-এক। তাতেই মহা খুশি। এ দুধ নাকি 'খিড়ের লাহান', চিনি লাগে না। কিছু গরু বিদেয় করে গোয়াল হাল্‌কা করার কথা উঠলেই মুখ বেজার করে বলেন, "একদিন দুধ দিছে, আজ দেয় না বলে কসাই-এর হাতে তুলে দিমু।" টপ টপ করে দু'ফোটা চোখের জল গড়িয়ে পড়ে।

চলার পথে যেখানে যতটুকু উপকার পেয়েছেন তার দ্বিগুণ করে ফিরিয়ে দিতে চেয়েছেন সারাটা জীবন। কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছেন জনে জনে। প্রথম আশ্রয় দাতাদের অনেকেই গত হয়েছেন। পরবর্তি কালে তাদের বংশধরদের কারো সঙ্গে সাক্ষাৎ হলেই কর-জোড়ে বলে উঠেছেন, "আপনাদের বহু অন্ন ধ্বংস করেছি। আমি কুসন্তান। প্রতিদানে কিছুই করতে পারলাম না।"

তখন তিনি সম্মানের উচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত। তার উক্তি পরিবার

পরিজনদের কাছে সুখশ্রুতি হয় কিনা সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। তেমন লোকের সাক্ষাৎ পেলে সভাস্থ সকলের সামনে ছেলে-মেয়ে নাতি-নাতনিকে হেঁকে ডেকে বলে ওঠেন, "ওনারা আমার অন্নদাতা প্রভু। এ কথা ভুল না কোন দিনও।"

ওয়াজীর খাঁ-র নাতি নসীর খাঁ-র ছেলে দবির খাঁ। অকালে পিতৃবিয়োগ হওয়াতে তাঁর সঙ্গীত শিক্ষায় ব্যাঘাত ঘটে। ঠাকুরদা পুত্রশোকে মুহ্যমান। এই শোকাবিভূত পরিবারে আলাউদ্দিন মস্ত সহায়। রামপুর থাকতে পুত্র স্থানীয় দবির খাঁকে তিনি কোলে পিঠে করে মানুষ করেন। অনেক ক্ষেত্রে সঙ্গীতের তালিমও তিনি দিয়েছেন।

রংমহল থিয়েটারে আলাউদ্দিনের সম্মানে আয়োজিত আসর। দবির খাঁ-ও আমন্ত্রিত হয়ে উপস্থিত হয়েছেন। আলাউদ্দিন শশব্যস্ত হয়ে লাফিয়ে উঠলেন। দবির খাঁ-কে তার আসনে বসাবার জন্যে পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। 'গুরু বংশের সন্তান, এ আসন তারই প্রাপ্য।' যা উপহার পেলেন তা দবির খাঁ-র পায়ে রাখলেন। 'এ উপহার তাকেই সাজে।' আসরে বাজাবার আগে নাক কান মলে দবির খাঁ-র কাছে অনুমতি প্রার্থণা করলেন, "গুস্তাকি মাপ করবেন। আপনার সামনে বাজাতে বসা আমার ধৃষ্টতা।"

যোধপুরের রাজ সভায় আমন্ত্রণ পেয়ে বাজাতে চলেছেন আলা-উদ্দিন। সঙ্গে রবিশঙ্কর। সারা পথ রবিশঙ্কর পই পই করে বললেন, "বাবা যোধপুরের মহারাজ আপনার বাজনার তারিফ করলে আপনি উঠবেন না। আপনার সম্মানেই এই আসর। আপনি উঠে দাঁড়ালে সব পণ্ড হয়ে যাবে।"

আলাউদ্দিন জামাতার কথার তাৎপর্য বুঝলেম। স্বীকার করলেন, "বাবা, তুমি যেভাবে বলবা, সেই ভাবেই চলব।"

মহারাজার আমন্ত্রিত সম্ভ্রান্তের দল আসরে উপস্থিত। আলাপের

প্রথম মোচড়েই মহারাজা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন, "আহা! ক্যায়া-বাৎ!"

অমনি আলাউদ্দিন কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্যে সামনের দিকে দু'হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন, "মালেক, এ আপনার মেহেরবানি।"

মহারাজাও গুণীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্যে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে মহারাজার সম্মানে সভাসদ সবাই উঠে দাঁড়াল। রবিশঙ্কর করুণ ভাবে বাবার দিকে চেয়ে চুপ করে বসে রইলেন। আলাউদ্দিন আত্মস্থ হয়ে আবার আসন গ্রহণ করলেন। সবাই বসল। হঠাৎ রবিশঙ্করের দিকে চেয়ে বেজার মুখ করে আস্তে বললেন, "ও, তুমি না করছিলা।" তারপরে মগ্ন হয়ে গেলেন সুরে।

অধুনা বাংলাদেশ, তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তান। ১৯৬৪ সালে শেষবারের মত জন্মভূমি দর্শনে গেলেন আলাউদ্দিন। পূর্ব বাঙলার নরম মাটি যেন কথা কয়ে উঠল। হারানিধি ফিরে পাবার ব্যাকুলতা। হাজারে বিজারে লোক আসতে লাগল আলাউদ্দিন দর্শনে। তারা বাজনা শুনতে চায় না। শুধু চোখের দেখা দেখতে চায়। উনি মানুষ না পয়গম্বর-। জনশ্রুতিতে পল্লবিত তার কীর্তি গাঁথা।

আলাউদ্দিন আশৈশব গৃহহারা। দেশ ছাড়া। কিন্তু অদৃশ্য নোঙরের মত শিবপুর গ্রাম তাকে বেঁধে রেখেছে অন্তরের বন্ধনে। তিনি যত দূরেই যান, অন্তরের টান পড়েছে। তখন তিনি প্যারীসে, সেখান থেকে দেশে তার এক অনুগত ভক্তকে লিখলেন, "...দয়া করে আপনি আমার জন্যে চেষ্টা করুন শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজ শিবপুরের জমিদারকে আদেশ করিলেই ঐ পুকুর মজ্জিদ মকৃররি করে দিবে আমি আর কিছু চাহি না......মকৃররি করে দিলেই শিবপুর বাড়ি করিব।"

তারপর ভৈরব নদী দিয়ে কত জল বয়ে গেল। দেশ বিভাগ হল। দাঙ্গা-ফাঁসাদ। শিবপুরে বাড়ি আর করা হল না। এবার ব্রাহ্মণ-বাড়িয়ায় ছোট ভাই আয়েত আলির বাড়িতে উঠলেন আলাউদ্দিন। স্থানীয় যুব-ছাত্ররা বাঁশ দিয়ে ঘিরে দিল। ভিড় নিয়ন্ত্রনের জন্যে ভালন্টিয়াররা দাঁড়ল গেটে। সারিবদ্ধ জনস্রোত চলেছে আলাউদ্দিন দর্শনে। গেটে দর্শনী দিয়ে ঢুকতে হচ্ছে। দশ দিনে কয়েক হাজার টাকা সংগৃহিত হল। টাকার তোড়াটি আলাউদ্দিনের হাতে তুলে দিলে তিনি মাথায় ঠেকিয়ে বললেন, "এ আমার জন্মভূমির প্রাপ্য। অধম সন্তান মায়ের জন্যে কিছুই করতে পারে নি। একটা মস্জিদ আর একটা পাবলিক পুকুর কর এই টাকা দিয়া। আমি নিমিত্ত মাত্র।"

॥ ছয়॥

সেবার কলকাতায় এসে আলি আকবরের কবীর রোডের বাসাতে উঠেছেন। সকালের নমাজ সেরে বাইরের ঘরে মাদুর বিছান আসরে এসে বসলেন। গেরুয়া বসন। উদাসী বাউল। ইতিমধ্যেই কয়েকজন শিষ্য-ভক্ত ছিটিয়ে ছড়িয়ে চুপ করে বসে আছেন। বাড়ির ভেতর থেকে গড়গড়ায় তামাক সাজিয়ে এনে দিয়ে গেল। তিনি নলটা ধরে মুখের কাছে সবে তুলেছেন এমন সময় স্বামী প্রজ্ঞানন্দ ঢুকলেন ঘরে। হাতে নিজের লেখা সদ্য প্রকাশিত সঙ্গীত বিষয়ক গ্রন্থ। স্বহস্তে আলাউদ্দিনকে উপহার দিতে এসেছেন।

নলটা মুখ থেকে ঝট্‌কা মেরে ফেলে দিয়ে আলাউদ্দিন লাফিয়ে উঠলেন। সুরু হল এক মর্মস্পর্শী দৃশ্য। আলাউদ্দিন স্বামীজীর

পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে যান, আর স্বামীজী চান আলাউদ্দিনের পায়ের ধুলা নিতে। উভয়ে উভয়ের পায়ে পড়ছেন। শেষ পর্যন্ত দু'জনেই বসে পড়লেন মাদুরে।

আলাউদ্দিন ছেলে মানুষের মত গড়গড়ার নলটা লুকোতে চাইলেন। যেন ও জিনিসটা তিনি জীবনে সেবন করেননি। অসহায় ভাবে কয়েকবার বাড়ির ভেতরের দিকে তাকালেন। কেউ এসে যেন গড়গড়াটা নিয়ে তার মান রক্ষা করে। আশী বছরের শিশু ধরা পড়েছে। তাকে উদ্ধার করতে কেউ এল না। গড়গড়াটা পুড়ে পুড়ে নিভে গেল।

আলাউদ্দিন স্বামীজীর হাত থেকে বইটা নিয়ে নিজের মাথায় রাখলেন। "আমি এর কি বিচার করমু। আমার কি জ্ঞান আছে। এ থাকবে আমার মাথায়।"

শিশুর মত উচ্ছ্বসিত। এরি ফাঁকে ফাঁকে স্বামীজী সঙ্গীত বিষয়ক একটি দু'টি প্রশ্ন করছেন। আলাউদ্দিন স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে 'সরগম' করে সুরে তার জবাব দিচ্ছেন। হঠাৎ তিনি শিশুর মত কেঁদে ফেললেন। তার মন চলে গেছে কোন সুদূরে। কিছুতেই কান্না থামতে চায় না। দু'চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। কান্না-ভাঙা গলায় বলতে লাগলেন, "হায়! হায়! আমি কি দুর্ভাগা। তিনি (রামকৃষ্ণ) জীবীত ছিলেন কিন্তু আমার সঙ্গে তার দেখা হল না। এ দুঃখু আমি কুথায় রাখি।"

উপস্থিত সকলেরি চোখের পাতা ভিজে উঠল। মেয়েরা ঘনঘন চোখ মুছতে লাগলেন। স্বামীজীও চাদরের খুঁট দিয়ে চোখ মুছলেন। আলাউদ্দিন কান্নায় বেপথু।

ঐ পাগল ঠাকুরের মতই ভাবে বেহুশ। এ সঙ্গীতের ভাব। তার কাছে সঙ্গীত চিন্ময়। তার সঙ্গে চলে মান অভিমান, কথোপ-কথন। ক্ষণে হাসায়, ক্ষণে কাঁদায়, আঘাত করে, দুঃখ দেয়।

মাইহারের বাড়ীতে কয়েকজন অনুরাগী এসেছেন। তাদের বাসনা সুরশৃংগার শুনবেন। কিন্তু যন্ত্রটির সব তারই গেছে ছিঁড়ে—একটি কোনমতে টিকে আছে। ভক্তের পীড়াপীড়িতে তাতেই সুর বাঁধলেন ওস্তাদজী। ধরলেন দরবারী কানাড়া। দোলায়িত কোমল গান্ধারে যন্ত্রটি যেন কান্নায় ভেঙে পড়তে লাগল। অপূর্ব সুরাবেষ্টনে ভক্তরা মূক, মৌন। আচমকা ওস্তাদজী বাজনাটি নামিয়ে রাখলেন। কাপড়ের খুঁটে চোখ মুছতে মুছতে বললেন, "গান্ধারটা বড় কষ্ট দিচ্ছে। বুকে লাগে।"

তখন তিনি বিশ্বভারতীর 'আমন্ত্রিত অধ্যাপক' হিসেবে রয়েছেন শান্তিনিকেতনে। একদিন সকালে ছুটির দিনে ভৈরবীর আলাপ শোনবার জন্যে অধ্যাপক-ছাত্রের দল তাকে ঘিরে বসল। নাতি আশিসকে সঙ্গে নিয়ে বসলেন গুরুজী। আলাপে ভৈরবী রাগিনীর রূপটি যেই মূর্তি ধরে উঠেছে—অমনি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন শিল্পী। সব সময় এ সুর বাজতে চায় না বলেই তার মনে দুঃখের শেষ নেই। তানপুরায় সুর বাজছে। অল্পক্ষন চুপ করে থেকে আবার শুরু করলেন সেই আলাপ। শ্রোতারা সকলে নিঃশব্দে বসে। সকলেরই মনের মধ্যে একটা শিহরণ। অপূর্ব এক গম্ভীর বেদনার জাল রচনা করে চলেছে শিল্পীর দুই হাত। চোখ বন্ধ। ধ্যানস্থ।

কুড়ি মিনিট এই ভাবে চলার পর হঠাৎ রাস্তায় মোটরগাড়ির হর্ণের বিকট বেসুরো শব্দে সকলে চমকে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে আলাউদ্দিন হাত ঝাড়া দিয়ে হতাশ কাতর স্বরে বলে উঠলেন, "যাঃ সব চলে গেল!"

বাংলা দেশের বাউলদের 'মনের মানুষের' জন্যে বিরহ-বেদনার যেমন শেষে নেই, তেমনি আলাউদ্দিনের আরাধ্যা-দেবী সঙ্গীতের জন্যে বিরহ-বেদনাও কোনদিম শান্ত হল না। ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়

ইঙ্গিতে। পেতে পেতেই হারাবার আক্ষেপ। তবু ধ্যানের কল্প-মূর্তিখানি সদা জাগ্রত থাকে অম্লান হয়ে।

আসরে ঠুংরি বাজবার অনুরোধ এলে নয়নজলে করজোড়ে বলেন, "মা-কে বে-পর্দা করতে পারব না। ঠুংরি আমার হাতে আসবে না।"

চেতনার এই উর্ধ্ব গগনে মৃত্তিকার আবিলতা, ধর্ম-সমাজ-সংস্কারের প্রাচীর অনুপস্থিত। কোন ছায়া পড়ে না আলাউদ্দিনের জীবন জীজ্ঞাসায়। সবার ওপরে সত্য হয়ে ওঠে মানুষ।

* * *

ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ বিষবৃক্ষ রোপন করেছিল। ত্রিশের দশকে তা ফলপ্রসূ হল। পাকিস্তানের জিগির উঠল দিকে দিকে। সাধারণ হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সন্দেহ, দ্বেষ, হানাহানি। সেই যুগে আলাউদ্দিন ত্রিপুরায় তার এক হিন্দু শিষ্যের কাছে লিখলেন, "আমার স্ত্রী প্রাচিন হয়েছে তার দ্বারায় সংসারের কাজকর্ম অক্ষম, এর সেবার জন্যই এমন কোন নিরাশ্রয় মেয়ে চাই। হিন্দো হ.লই ভাল হয়। যদি মুসলমানও পাওয়া যায় তাতেও ক্ষতি নাই, আমার কাছে থাকিলে কুনরূপ কষ্ট হবে না।"

পুত্রকন্যার নামেও হিন্দু মুসলমানের মিলন ঘটিয়েছেন। জামাতা করে গ্রহণ করেছেন রবিশঙ্করকে। কোন দ্বন্দ্ব নেই, কোন সংঘাত নেই, কোন আত্মশ্লাঘা নেই। কোন রাজনৈতিক ব্যাখ্যা দেননি। কোন সমাজ সংস্কারের গরিমা করেননি। নতুন ধর্মমত প্রচারের মহিমা কীর্তন অনুপস্থিত।

শুক্রবার। গুড ফ্রাইডে। আলাউদ্দিনের গল্পাচারির আসরে একে একে শিষ্যরা এসে জড় হল। সেদিন শ্রীলঙ্কার জনৈক খৃশ্চান শিষ্য উপস্থিত আছেন। গুরুজী তার কাছে যীশু সম্বন্ধে জানতে চাইলেন। তিনি পূর্বাপর যীশুর কাহিনী বলে যখন থামলেন তখন

গুরুজীর দু'চোখ দিয়ে ধারা নেমেছে। ভাঙা গলায় বললেন, "অমন মানুষটাকে বেবাকে মিলে মারল!"

এই মানব প্রেমের আলোয় উদ্ভাসিত হয়েছে তার চলার পথ। কবিগুরু রবীন্দ্রাথের মত মানবতাবাদী বিশ্বদৃষ্টি কোনই হয়েছে তা: শুভ-অশুভ বিচারের মাপ কাঠি। সহজাত মানব প্রেম তাকে যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তির স্বপক্ষে এনে দাঁড় করিয়েছে। নিষ্ঠাবান মুসলমান হলেও ভাসিয়ে নিয়ে গেছে তার সংস্কারের গণ্ডি।

তার রাগ নিবেদনের ঝঙ্কারের গভীরে কেউ যদি কাছ থেকে কান পেতে শোনেন তবে শুনতে পাবেন উনি মুখে নাম জপ করছেন। "আল্লা! আল্লা!...রাম! রাম!...সীতারাম!...ও গড!"

একবার ভ্রাতৃঘাতিদাঙ্গার কথা শুনে অস্ফুট স্বরে বলতে লাগলেন, "মানুষ! মানুষ হত্যা!...মানুষ!" এই বাক্যহারা বাগাড়ম্বরহীন জীবনই তার বানী।মানব কল্যাণে সম্পৃক্ত!

ষাটের দশকের শেষের দিকে যেন তিনি শুনতে পেলেন মৃত্যুর পদধ্বনি। বুক ভরা সুরকণ্ঠে এসে ভেঙে যায়, যন্ত্র যেন ব্যক্ত করতে পারে না সৃঠিক ভাবে। এক ব্যাকুল যন্ত্রণা। অসহায়।

আলাউদ্দিন তার সহজাত বুদ্ধি দিয়ে বুঝে নিলেন, মানুষ এ ত্রুটি সইবে না। তাই তিনি আস্তে আস্তে নিজেকে গুটিয়ে নিলেন। আসরে বাজান ছেড়ে দিলেন। যিনি তার অন্তরের আকুতি বুঝে প্রকাশের অক্ষমতাকে ক্ষমা করতে পারবেন সেই দয়াময় আলাতাল্লার পায়ে নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে সপে দিলেন। তর্ক নেই, যুক্তি নেই, চোখের জলে ধুলায় পড়ে আত্মনিবেদনের অভিব্যক্তি তার অন্তর জুড়ে বসল। কাঁপা কাঁপা হাতে কলকাতার এক শিষ্যকে লিখলেন, "বাবা, আমার ঘরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীবিবেকানন্দের ফট আছে। কিন্তু শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের কুন ফট নাই। তুমি অতি অবশ্য একখানা শ্রীশ্রী-গৌরহরির ছবি পাঠাইবা। এই আমার শেস নিবেদন।"

।। সাত ।।

শান্তিনিকেতন থেকে বিদায় নেবার কালে গুরুদেব নন্দলাল বোসকে ডেকে বললেন, "নন্দলাল আলাউদ্দিনের মাথাটা রেখে দাও।" কৌতুক করে আলাউদ্দিন এ ঘটনার উল্লেখ করেছেন বহুবার। "না, না, ভয়ের কিছু নাই। নন্দলালবাবুর এক ছাত্র নাম রামকিঙ্কর আমার মাথাটা রেখে দিল মূর্তি তৈয়ার করে।"

রবীন্দ্র যুগে কোন শিল্পীর জীবনে এর চেয়ে আর কি সম্মানের শিরোপা থাকতে পারে। যিনি সর্বকালের শ্রেষ্ঠ কম্পোজারের কাছ থেকে ভারতের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রতিভূ হিসেবে বরমাল্য পেয়েছেন তাকে আর কে কি ভূষণে সাজাবে? সভা-গায়ক, পদ্মভূষণ, ডক্টরেট, আমন্ত্রিত অধ্যাপক, অধ্যক্ষ, পরীক্ষক, শান্তির দূত—এই সমাজের প্রচলিত খ্যাতির নিশানাগুলি কি নাগাল পেয়েছে ঐ নিরাভরণ ধূলি ধূসরিত বাউল মনের?

কবিগুরুর মতই দীর্ঘ জীবন, তারই মত চলার পথের দু'ধারে সৃষ্টি-ফসলের এমন অফুরন্ত প্রাচুর্য দেখে যাওয়া আর কোন শিল্পীর ভাগ্যে ঘটেনি। কিন্তু নিজে থেকেছেন উদাসীন। শিশুর মত আত্ম-ভোলা। নাতি নাত্‌নিদেব শিশুপাঠ্য গল্পগুলিই তার শেষ জীবনে অবসর বিনোদনের সঙ্গী। সংসারের জটিলতা নেই, আবিলতা নেই। চিরকালের কৌতূহলী শিশু যেন বাসা বেঁধে রয়েছে তার মনের গভীরে। সারা ইউরোপ ঘুরে ইংল্যাণ্ডে ভারটিংটন।হলের শিশুদের পেয়ে আলাউদ্দিন যেন বেঁচে গেলেন। 'আমার সঙ্গে তাহাদের খুব ভাব হইল। কাঁধে চরে, দারি টনে, কিল ঘুসি মারে আর চুমু খেয়ে ব্যতিব্যাস্ত করে তুলে। এই দেবশিশুদের পেয়ে আমি ইউরোপে প্রাণ পেলাম।'

সরল জীবন সহজ অভিব্যক্তি। পোষাকে আষাকে আহার-আচরণে। ইউরোপের নামজাদা হোটেলেও লুঙ্গী তার 'নাইট

গাউন'। কাঁটা-চামচের ঠোকাঠুক্কির শব্দে মরমে মরে যান না। বাজাতে বসেন ভারতীয় পোষাক পরে। কোন শঙ্কোচ নেই। খুব প্রাঞ্জল ভাষাতেই ব্যক্ত করেন, "...খাওয়া পড়াতে আমার কষ্ট হয় আমি মাংস খাই না। এতব দেশে মছ মাংশ ছারা ঐণ্য আহার করে না। আমি কেবল সাগ্ সবজি সিদ্ধ ও ধুগ্ধ মাখন ও রুটি খেয়ে আসিতেছি।"

ষাটের দশকের শেষের দিকে বার বার অসুস্থ হয়ে পড়তে লাগলেন। মাইহারে তখন দারুণ গ্রীষ্ম। বাড়ির কারো কথাটা বলার সাহস হল না। রবিশঙ্কর ভয়ে ভয়ে বললেন, "বাবা, এই গরমে কষ্ট পাচ্ছেন একটা ঠাণ্ডা করার যন্ত্র বসিয়ে দেব ঘরে?"

আলাউদ্দিন হাতের ইঙ্গিতে নিষেধ করলেন, "বাবা, যিনি আসছেন, তারে আসবার দেও। তুমরা যদি নতুন করে ঘর সাজাও তবে পুরান আলমকে চিনতে না পেরে উনি চলে যাবেন।"

কবিগুরু বাসনা করেছিলেন শেষ বেলাকার ঘরখানি মাটিতে বানাবেন। মাটির সঙ্গে মিশবে মাটি। কোন দ্বেষ নেই, কোন অহমিকা নেই। কালের অমোঘ স্পর্শকে ঠেকাবার জন্যে কোন পাকাপোক্ত সৃষ্টির খুঁটি পোঁতার প্রাণান্তকর পরিকল্পনা নেই। আলাউদ্দিন তার এক প্রিয় শিষ্যকে ডেকে বললেন, "আমার উঠানের ঐ উত্তর-পূবের দিকে আমাকে কবর দিও। মাটির সঙ্গে মাটি হয়ে যামু।" কোন মন্দির নয়, মঞ্জিল নয়। "ঐ মাটির উপর আমার পুত্ররা বসে বাজনা বাজাবে। আমি শুয়ে শুয়ে শুনব।"

যুগ মানবের মহাপ্রয়াণ। মাটির সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবেই মিশে যাবে মাটি। স্নিগ্ধ প্রশান্ত ক্ষমা সুন্দর বিদায়। ১৯৭২ সালের ৬ই সেপ্‌টেম্বর রাত ১১টা ১০ মিনিটে এল সেই বিদায়ের ক্ষণ। বিশ্বব্যাপী সুর বিস্তার করে সুরের কাঙাল চির বিদায় নিলেন। ছায়া সঙ্গিনী ছায়ার মতই পড়ে রইলেন পেছনে। কাব্যের উপেক্ষিতা।

সমাপ্ত